১৬ এপ্রিল ১৯৮৬ □ আনন্দবাজার প্রকাশন □ তিন টাকা

আনন্দমেলা

Hard Copy, Scan & Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

CLARION/B/GX/10/244 BEN

আনন্দমেলা

৩ বৈশাখ ১৩৯৩ □ ১৬ এপ্রিল ১৯৮৬ □ ১২ বর্ষ ১ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস
ভীষণ বিপদ । হিমানীশ গোস্বামী ৩৫
গল্প
পিলুর সুখ-দুঃখ । বুদ্ধদেব গুহ ৯
চলো যাই ঘুমের দেশে । কবিতা সিংহ ১৩
বাজনা । বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২৫
হুদো । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯
বিপিনবাবু আর নমকসেবক । অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৫১
ছড়া ও কবিতা
শীত গিয়েছে । প্রেমেন্দ্র মিত্র ৮
ধারাবাহিক উপন্যাস
গোলমাল । শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ১৬
ডোরাকাটা জামা । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ৫২
বিজ্ঞানবিচিত্রা
প্রত্ন-প্রস্তর যুগ । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
আট-পা'ওয়ালা প্রাণী । মৃণালকান্তি দাশ ১৫
শুকতারা তারা নয় । অনিশা দত্ত ২৪
জেনে নাও । অরূপরতন ভট্টাচার্য ২৮
শার্লক হোমসের গল্প
হলদে মুখ । সার আর্থার কোনান ডয়েল ৫৫
লেখাপড়া
পল্বল···পরাকাষ্ঠা···(অর্থ জানো) । দেব-সেনাপতি ৭
এবার নববর্ষে (সহজে ইংরেজি) । প্রসাদ ৭
ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয় । শ্যামলকান্তি দাশ ৩২
খেলাধুলো
হায় ভারতীয় টেনিস । সুজয় সোম ৬২
হায় ফুটবল । রত্না শূর ৬৩
জ্যাটোপেক, জ্যাটোপেক । সম্রাট রায় ৬৪
বেটন কাপের যুদ্ধে । অজয় বর্মা ৬৫
ক্রিকেটারদের গল্প । রাজা গুপ্ত ৬৬
চিত্রকাহিনী ও কমিকস
টিনটিন ২০, রোভার্সের রয় ২২, টারজান ৩১
গাবলু ৬১
অন্যান্য আকর্ষণ
ডাক্তারবাবু বলছেন । (ডাঃ) বিশ্বনাথ রায় ২৮
তোমাদের পাতা ৪৯, ধাঁধা ৫৮, শব্দ-সন্ধান ৫৮
মজার খেলা ৫৯, হাসিখুশি ৫৯

প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বিজিৎকুমার বসু কর্তৃক ৬ ও ৯ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০১ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত । দাম তিন টাকা । বিমান মাশুল ত্রিপুরা ১০ পয়সা ; উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা । পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা

শরীর সতেজ করে, মনে আনে স্ফূর্তি এই ড্রিঙ্ক!

"আমি আমার বাচ্চাদের, এক কাপ দুধে দু'চামচ করে পুষ্টিগুণ ও আস্বাদেভরা পানীয় বোর্নভিটা, দিনে দু'বার ক'রে দিই।

বোর্নভিটা থেকে কোকো, মল্ট, দুধ আর চিনির পুষ্টি পায় বলে আমার বাচ্চারা ওদের বাড়ন্ত বছরগুলির প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও শক্তি যথাযথভাবে পায়— তাইতো, পালন-পোষণ সঠিকভাবে করতে, বাচ্চাদের বোর্নভিটা হ'বেই খাওয়াতে।"

এটি বোর্নভিটা ভরা বর্ষ.
যার জন্য এরা একদিন আপনাকে জানাবে ধন্যবাদ অজস্র.

এবার প্রতি ৫০০ গ্রাঃ রিফিল প্যাকের ওপর ২ টাকা বাঁচান।

OBM/4638/BEN

প্রত্ন-প্রস্তর যুগ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

প্রত্ন হল পুরনো। পুরনো পাথরের আমল। মানুষ হওয়া থেকে শুরু করে খ্রিস্টজন্মের পাঁচ হাজার বছর আগে পর্যন্ত—এই সময়কাল। তখন মানুষের দুর্ভোগের অন্ত ছিল না। গোড়ার দিকে পড়ে-পাওয়া গাছের ডাল আর পাথরই ছিল তার একমাত্র হাতিয়ার। পরে তা দিয়ে সে লাঠি আর কুড়ুল বানাতে শুরু করেছে।

পৃথিবীর জলহাওয়াও মানুষকে কম জ্বালায়নি। এই আমলে চারবার পৃথিবীর বিরাট অংশ বরফে ঢেকে গিয়েছিল। মাঝখানের গরমের বছরগুলোতে মানুষকে বুনো ফল, ব্যাঙের ছাতা, গাছের কন্দ খেয়ে কাটাতে হয়েছে। বনজঙ্গলে ফলমূলের তখন খুব অভাব। কাজেই এই সারাটা সময়ই মানুষের কেটেছে কী-খাই কী-খাই করে। কেবলই পেটের ধান্দায়।

পিকিং-মানুষ আর তাদের অন্যান্য জায়গার জাতভাইয়েরা ঠাণ্ডার বছরগুলোতে ভালুক মেরে তার চামড়ায় তাদের শীত নিবারণ করতে আর বেশি করে মাংস খেতে শুরু করল।

এই সময় এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। এতদিন আগুনের জন্যে মানুষকে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজেপেতে জ্বলন্ত কাঠ জোগাড় করতে হত। কিন্তু এবার সে এমন এক কৌশল আবিষ্কার করে ফেলল, যাতে যখন-তখন যেখানে-সেখানে আগুন জ্বালিয়ে নেওয়া যায়।

তারপর বনজঙ্গল ছেড়ে দিয়ে ফাঁকা জায়গায় এসে মানুষ শেষ পর্যন্ত বাইসন, গোরু, ভেড়া, ঘোড়া, বুনো-শুয়োর শিকারে মন দিল।

এই সময় আরেকটা জবর ব্যাপার হল।

মানুষ দেখল, সবার হাতে যদি লম্বা লাঠির আগায় পাথরের তীক্ষ্ণ ফলা লাগানো একটা করে বর্শা থাকে, তা হলে তারা দল বেঁধে তাড়া করে অতিকায় ম্যামথ অবধি মারতে পারে। তাতে একসঙ্গে অনেক লোকের বেশ কিছুদিনের খাবার জুটে যেতে পারে। তখন কিছু লোক দল বেঁধে ম্যামথ মারার শক্ত কাজের ভার নিল। মারার পর একদল রইল ছাল ছাড়িয়ে মাংস কাটার দায়িত্বে। বাকি লোকেরা দল বেঁধে ফাঁকা মাঠে মাথা গোঁজার ঠাঁই তৈরির কাজে লেগে গেল।

এই সময় এত কষ্ট পেয়েও মানুষ নিজেকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে। এরপর তুষার যুগ শেষ হওয়ায় সুবিধেমতো আবহাওয়ায় মানুষ এখানে-সেখানে দল বেঁধে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। গোড়ায় মানুষ বেরিং প্রণালীর ভেতর দিয়ে এশিয়া থেকে আলাস্কায় এবং উত্তর আর দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছয়। ঠাঁই বদলের এই ব্যাপারটা ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ২৫,০০০ সাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫,০০০ সাল—এই প্রাগৈতিহাসিক দশ হাজার বছরের মধ্যে।

প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষেরা আজকের তুলনায় ছিল খুবই পিছিয়ে। কিন্তু তবু সেই আদিম পূর্বপুরুষদের কাছে এ যুগের মানুষের ঋণের শেষ নেই। প্রথম তারাই তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান কথায় প্রকাশ করে নিজের সন্তান-সন্ততিদের দিয়ে যায়। তারা বানিয়েছিল নানা যন্ত্রপাতি আর কাজের জিনিস। এমনকী সেলাইয়ের ছুঁচ আর তেলের প্রদীপ প্রথম তারাই বানিয়েছে। তাদের মনস্কামনা তারা প্রকাশ করেছিল নাচ আর গানে। গুহার দেওয়ালে এঁকেছিল অবাক-করা সব ছবি। তৈরি করেছিল পাথরের আর হাতির দাঁতের মূর্তি। মৃতকে কবর দেবার প্রথাও তাদেরই আমলে শুরু হয়।

প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষদের অন্যতম খাদ্য ছিল ম্যামথের মাংস

চিরকালের বই, ঝলমলে আনন্দ-সংস্করণ

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ক্ষীরের পুতুল

দাম ১০·০০

এক রাজার দুই রানী। দুও আর সুও। রাজামশাই বাণিজ্যে গেলেন। সুওরানীর কথামত নিয়ে এলেন দামী দামী গয়না আর শাড়ি। দুওরানী চেয়েছিলেন একটা বানর-ছানা। তাঁর জন্য এল তাই বানর।

বানর হলে হবে কি, আসলে সে এক জাদুকরের দেশের মায়া-বানর। তাই সে মানুষের মত কথা বলে, ছেলের মত ভালবাসে বড় রানীমাকে, দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে চায়।

তা, সেই মায়া-বানর দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে কী করে রাজার মন ফেরাল বড় রানীর দিকে, কী করে দুওরানীর কোলে এনে দিল সত্যিকারের রাজপুত্র, কী করেই বা হিংসুটে সুওরানীকে ভোগ করাল যাবতীয় পাপের শাস্তি—তাই নিয়েই এই অবাক-করা রূপকথা, 'ক্ষীরের পুতুল'।

আর, এ-গল্প যিনি শুনিয়েছেন, তিনিও এক অবাক-করা জাদুকর। ছবি তাঁর হাতে কথা, কথা হয়ে উঠত ছবির মতন।

আনন্দ সংস্করণ 'ক্ষীরের পুতুল'-এ বার পৃষ্ঠা চোখ-জুড়োনো রঙীন ছবি ও রঙচঙে প্রচ্ছদ এঁকেছেন আশিস সেনগুপ্ত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

বুড়ো আংলা

দাম ১৫·০০

নাম রিদয়, কিন্তু ছেলেটা আসলে ছিল হৃদয়হীন। তার উপর, যাকে বলে একেবারে বিচ্ছু ছেলে। নষ্টামি করেই দিন কাটত তার। মানুষ বলো, পশুপাখি বলো, কীটপতঙ্গ বলো—সব্বাই অতিষ্ঠ তার জ্বালাতনে।

একদিন সেই বিচ্ছু রিদয় লাগল গণেশঠাকুরের পিছনে। আর যাবে কোথায়! ভীষণ রেগেমেগে গণেশঠাকুর তাকে এমন অভিশাপ দিলেন যে, দেখতে না-দেখতে বুড়ো আঙুলের মতো ছোট হয়ে শেষাবধি বুড়ো আংলা যক হয়ে গেল রিদয়।

হায় হায়, কী করবে এখন রিদয়?

গণেশঠাকুরের শাপে বুড়ো-আংলা রিদয় তারপর যা করল আর যা দেখল—তাই নিয়েই এই কৌতূহলকর উপন্যাস, 'বুড়ো আংলা'।

গল্পের খিদে যেমন মেটায় এই কাহিনী, সেইসঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় মাটি-নদী-বন-পাহাড় দিয়ে গড়া অপরূপ এক বাঙলাদেশের সঙ্গে।

ঔপন্যাসিকের কলম, শিল্পীর তুলি আর কবির কল্পনা—এই তিনের দুর্লভ সংমিশ্রণ ঘটেছে অবনীন্দ্রনাথের এই অসামান্য সৃষ্টিকর্মে।

দুর্দান্ত প্রচ্ছদ ও ভিতরে পাতাজোড়া-জোড়া ছবি। এঁকেছেন আশিস সেনগুপ্ত।

দুটি বই-ই ফোটোটাইপ সেটিং হরফে বিন্যস্ত। অফসেটে ছাপা। প্লাস্টিক ল্যামিনেটেড প্রচ্ছদ।

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, ফোন : ৩৪৪৩৬২

অর্থ জানো

পল্বল…পরাকাষ্ঠা…

বাংলা গদ্য রচনার নির্মাণ যুগে যিনি প্রথম রচনারীতির সুষমা আনেন, তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১)। তিনিই বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী। তাঁর লেখা 'শকুন্তলা,' 'সীতার বনবাস' থেকে 'বর্ণপরিচয়' সর্বত্রই সেই নৈপুণ্য। নীচের শব্দ ও বাক্যাবলি বিদ্যাসাগরের রচনা থেকে নেওয়া। প্রতিটি শব্দের পাশে কয়েকটি আনুমানিক অর্থ দেওয়া আছে। যেটি ঠিক মনে হবে, তাতে দাগ দেবে। সবশেষে উত্তরের সঙ্গে মেলাবে। শব্দের অর্থও ঠিক জানতে পারবে।

১। **সহকার**—(ক) সঙ্গী, (খ) সাহায্যকারী, (গ) লতা, (ঘ) আমগাছ।

২। **পল্বল**—(ক) পলিমাটি, (খ) হরিণের জলপান করার স্থান, (গ) ডোবা, (ঘ) নদী।

৩। **চরিতার্থ**—(ক) শান্ত, (খ) প্রশমিত, (গ) কৃতকার্য, (ঘ) পরিপূর্ণ।

৪। **মৃগতৃষ্ণিকা**—(ক) তৃষ্ণার্ত হরিণী, (খ) যা হরিণের তৃষ্ণা দূর করে, (গ) মরুভূমির হ্রদ, (ঘ) মরীচিকা।

৫। **পরাকাষ্ঠা**—(ক) বাড়াবাড়ি, (খ) চূড়ান্ত, (গ) কুশলতা, (ঘ) পরিপূর্ণ।

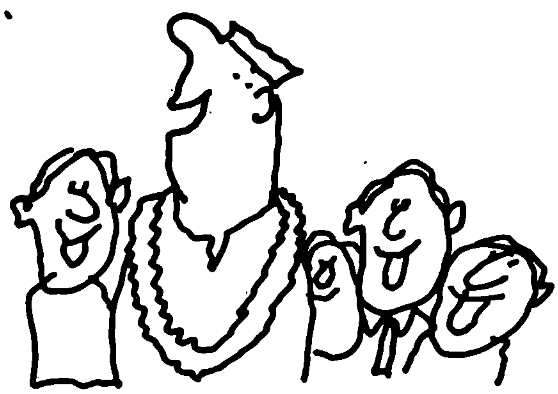

উত্তর : ১। **সহকার**—(ঘ) আমগাছ। যেমন, 'যেন সহকারতরু অঙ্গুলিসংকেত দ্বারা আমাকে আহ্বান করিতেছে।' ২। **পল্বল**—(গ) ডোবা। যেমন, 'উহাকে পল্বল হইতে জল আনাইয়া অধিকতর ক্লান্ত করা অনুচিত।' ৩। **চরিতার্থ**—(গ) কৃতকার্য, কৃতার্থ। চরিত শব্দের অর্থ সম্পন্ন, অর্থ শব্দের মানে প্রয়োজন। যেমন, 'আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইয়াছে।' ৪। **মৃগতৃষ্ণিকা**—(ঘ) মরীচিকা। সূর্যকিরণ বালির উপর পড়লে দূর থেকে জল বলে ভুল করে তৃষ্ণার্ত হরিণরা সেখানে ছুটে আসে। এই ভ্রমকেই মৃগতৃষ্ণিকা বলে। যেমন, 'শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মৃগতৃষ্ণিকায় পিপাসা শান্তি করিতে উদ্যত হইয়াছি।' ৫। **পরাকাষ্ঠা**—(খ) চূড়ান্ত। পরা অর্থ চরম, কাষ্ঠা অর্থ সীমা। যেমন, 'সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিয়াছেন।'

দেব-সেনাপতি

সহজে ইংরেজি

এবার নববর্ষে

এবার নববর্ষে চামেলিদের বাড়িতেই উৎসব হবে, ঠিক হয়েছে। উৎসব মানে, একটু নাচ-গান, হাসি-তামাসা, মজার কবিতা, মজার নাটিকা, ম্যাজিক ইত্যাদি।

Milly will sing the opening-song.
Chambal will tell some funny stories.
The magic show will be provided by Vinod Narsimhani, the amateur magician.
Vinod is Chambal's class-mate.
Chambal loves magic.
He hopes Vinod will teach him some of his tricks someday.
But the chief attraction of the evening's programme will be a short humorous play by Sukumar Ray.
Milly's mother, Mrs. Ray, has got some boys together for the play and is putting them through the rehearsals.
Chambal is a little worried at times.
"Will they laugh at my stories?" he asks himself. "It'll be terrible if they don't."
He has tried some of his stories on Milly, and she certainly laughed. But Chambal laughed, too.
Mrs. Ray said, "You mustn't laugh so much. Try to tell your stories with a straight face."

ইংরেজি ভাষার যে-সব নিয়ম-কানুন না মানলেই নয়, সেগুলোর কথা তোমাদের বিশেষ করে জানা দরকার।

যেমন ধরো, ইংরেজি বাক্যের কাঠামোটা কীভাবে তৈরি হয় ?

Milly will sing (the) opening-soon.
Chambal will tell (some funny) stories.

অর্থাৎ

Subject Verb Object

কিন্তু প্রশ্ন-বোধক বাক্যের বেলায় ?

Will they laugh at my stories?

এ নিয়ে সামনের বার আরও কথা হবে।

প্রসাদ

শীত গিয়েছে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

গেছে, গেছে, শীত গিয়েছে,
কখন গেল ? টের কি পেলে ?
গভীর রাতে ঘুমের ঘোরে
লেপটা কখন দিলে ফেলে !

সকালবেলা দেখলে কবে
আকাশটা আর হিমেলই নয় ?
একটা কেমন কুয়াশাতে
গা এলিয়ে বইছে সময় ।

আকাশ জুড়ে সেই যাযাবর
হাঁসগুলো ফের দিচ্ছে পাড়ি,
আসতে যেমন, তেমনি আবার
ফিরে যাবার তাড়াতাড়ি ।

যাচ্ছে কোথায় ? কোন্ সুদূরে
শীতটুকুকে সঙ্গে নিয়ে,
ক'টা দিনের কী যেন এক
গোপন মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে !

কী সে মন্ত্র ? জীবনটা নয়
পাকা বনেদ গেঁথে থাকা,
আসা-যাওয়ার দোল যদি না
সদাই থাকে, সবই ফাঁকা !

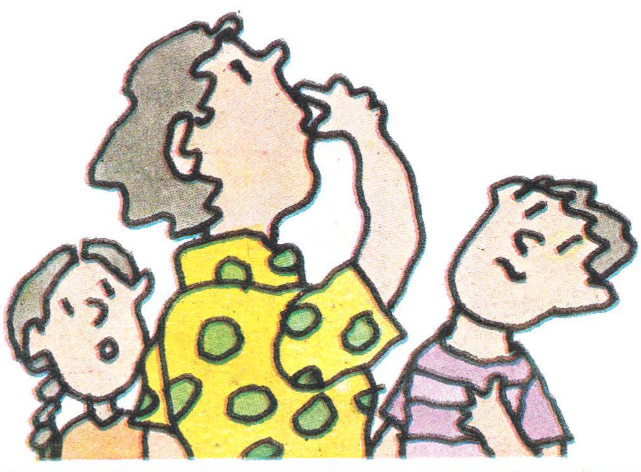

ছবি : দেবাশিস দেব

পিলুর সুখ-দুঃখ

বুদ্ধদেব গুহ

মহুয়াটোলির স্কুলের ছুটির ঘন্টা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। ছেলেরা এবং মাস্টারমশাইরাও প্রায় সকলেই চলে গেছেন। পিলু হেডস্যারের ঘর থেকে সবে বেরোল। স্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যের সারি করে লাগানো উক্যালিপ্‌টাস্‌ আর কেসিয়া গাছেদের নীচ দিয়ে এসে সাইকেল স্ট্যাণ্ড থেকে সাইকেলটা তুলে নিল। তারপর বইয়ের থলেটা ক্যারিয়ারে বেঁধে নিয়ে বাড়ির দিকে বেরিয়ে পড়ল জোরে প্যাড্‌ল করে।

বাড়ি ওদের অনেক দূরে। এই বুনো জায়গাতে আর ভাল স্কুল নেই কাছেপিঠে। তাই রোজ আট মাইল সাইকেল চালিয়ে আসে পিলু এবং আট মাইল ফেরে বনগাঁওয়ের দিকে বুনো পথ ধরে।

শীতের দিন বনের ছায়া ঘন হয়ে এসেছে পথের উপর। ছায়ারা দ্রুত লম্বা হয়ে যাচ্ছে পুবে। পুটুসের ঝাড় আর বুড়ো শালবনের গায়ের গন্ধে থমকে-থামা হাওয়া ম-ম করছে। পাখিরা আসন্ন রাতের ভয়ার্ত ডাক ডাকতে ডাকতে দ্রুত ডানায় ঘরে ফিরছে।

বুড়হাদেওয়ের ফাঁড়িতে পৌঁছেই গা ছমছম করে ওঠে পিলুর। রোজই। এইখানেই চারটে বুনো পথ এসে মিশেছে। বুড়হাদেওয়ের থান। মস্ত একটা সাজা গাছের নীচে। জায়গাটাতে দেওয়ের পায়ের গন্ধ পায় যেন।

পরবের সময় এইখানেই মেলা বসে। বুড়ির চুল, কাঁকোড়ের মালা, গালার আর রুপোর গয়না, বগারি-পাখি ভাজার দোকান, পুরি-কচৌরি-বালুসাই। খয়েরি-হলুদ-লাল-নীল কালো কাঁচের চুড়ি। বৈশাখী পূর্ণিমার চাঁদের আলোর মতো চকচকে রুপোর বাসন। লাল-নীল-সবুজ সিরাপ দেওয়া বরফের শরবত। সব কিছুরই দোকান বসে তখন। মানুষের গায়ের ঘামের গন্ধের সঙ্গে গোরু-ছাগল, মুরগি, তিতির, আসকল, বটেরের পালকের আঁশটে গন্ধ, বনপথের ধুলোর গন্ধ আর বনের গায়ের বুনো গন্ধ মিলে-মিশে যায়। মেলা, দিনের বেলায়। বহু দূর থেকে

দেখা যায় লাল ধুলো উড়ছে এই ফাঁড়ির উপরে। রাতে, হ্যাজাক আর লণ্ঠনের আলোর আভাসে উপরের আলোকিত আকাশকে আরও বহু দূর থেকে দেখা যায়। টেবো নদীর গর্জনের মতো এই মেলার গর্জনও মিলিয়ে যেতে থাকে তখন দূর দূরান্তরের গ্রামের দিকে ধুলো-পায়ে হেঁটে যাওয়া বন-পাহাড়ের মানুষের কানে।

ওই সাতটি দিন ছাড়া বছরের অন্য সময় জায়গাটা একেবারেই সুন-সান্নাটা থাকে। কোনও কোনও দিন ডি· এফ· ও· বা এস· ডি· ও· সাহেবের জিপ চলে যায় ধুলো উড়িয়ে গুড়গুড়ানি আওয়াজ তুলে। খাকি পোশাক পরা ফরেস্ট গার্ডরা সেজেগুজে দাঁড়িয়ে থাকে রেঞ্জ অফিসের সামনে। জিপের এঞ্জিনের শব্দের সঙ্গে মিশে-যাওয়া জিপের যাত্রীদের কথাবার্তার ছড়ানো-ছিটোনো টুকরো-টাকরা ঝুলে থাকে পথ-পাশের গাছে-পাতায় কিছুক্ষণ। তারপরই আবার ঝিঁঝির ডাক। একটানা। গা-ছমছম। পাতারা পাতার সঙ্গে কথা বলে, ফুলেরা ফুলের সঙ্গে, পাখিরা পাখির···

পিলুর মনটা আজ খুবই খারাপ। হেড-স্যার শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ পাণ্ডে তাকে বকেছেন খুবই। টেস্ট পরীক্ষাতে পিলুর রেজাল্ট যতখানি ভাল হবে বলে তিনি ভেবেছিলেন, ততখানি ভাল হয়নি। হেড-স্যারের এবং স্কুলের অন্য সব স্যারেরই খুব আশা ছিল যে, পিলু প্রি-ইউনিভার্সিটি পরীক্ষাতে স্ট্যাণ্ড করবেই। টেস্টের রেজাল্টে স্যারদের মনে সে-বিষয়ে গভীর সন্দেহ জেগেছে। স্যাররা অবশ্য পিলুর ভালই চান। পিলুও সেটা জানে। কিন্তু পিলু কি নিজেও তার ভাল চায় না?

ওর অসুবিধার কথা, সব যে বলতে পারে না ও সকলকে। সব কথা সকলকে বলা যায় না। বলতে যাওয়া বোকামিও। ওর নিজের ভালর জন্যে যে বকুনি মাস্টারমশায়দের কাছ থেকে আজ ওকে খেতে হল, তাতে ও দুঃখিতই হয়েছে শুধু। রাগ করেনি। অভিমানও করেনি কারও উপর। কারও উপর অভিমান করতে পারে, এমন মানুষ কি সকলেরই থাকে?

বাড়ি ফিরল যখন, তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। ছোট ভাই নিলু ছাগলগুলোকে পাহাড়তলির ঝাঁটিজঙ্গল থেকে চরা-বরা করিয়ে বাড়ি ফিরল। নিলু এখনও গাঁয়ের পাঠশালাতেই পড়ে। পরের বছর থেকে যাবে স্কুলে। এমন কথা আছে। পিলুর শেষ হবে স্কুল। নিলুর শুরু হবে।

পিলু-নিলুর মা অন্ধকার ঘরের ভিতর থেকে নাকি-নাকি সুরে বললেন, "পিলু, এলি বাবা?"

"হ্যাঁ, মা।"

বলেই, সাইকেল রেখে পিলু গিয়ে মায়ের পাশে বসল কিছুক্ষণ। জিজ্ঞেস করল, "কেমন আছ আজ?"

"আজ পূর্ণিমা। ব্যথাটা বেড়েছে বড়।"

"নিলুও খায়নি। নিলুকেও বলছি হাতমুখ ধুয়ে নিতে। খেয়েই আমি এসে তোমার পা টিপে দিচ্ছি," পিলু বলল।

"বৈদ্-এর কাছে যাবি না একবার পিলু বেটা?"

"যাব মা। কাল তো স্কুল নেই। কালই যাব। মোটে বারো মাইল তো পথ। সাইকেলে একেবারে টিকিয়া-উড়নে যাব আর আসব। দেখো, কাল ঠিকই যাব। মাথার ব্যথাটা তোমার আজ হয়নি তো আর?"

"না।"

॥ ২ ॥

পিলু-নিলুর বাবা ছিলেন মহুয়াটোলির কাছেই যে শহর আছে চাকাকাট্টি, সেখানের এক মস্তবড় ঠিকাদারের বিশ্বস্ত কর্মচারী। তাঁদের বাড়ি ছিল চাইবাসায়। বছরের ন'মাসই কাটত তাঁর জঙ্গলে-জঙ্গলে। কিন্তু ঠিকাদার শ্রীকান্ত শর্মা খুবই ইজ্জত করতেন তার বাবাকে। বাবা থাকুন আর নাইই থাকুন, তাঁর জিপ অথবা ট্রাক এ-পথে গেলেই বরাবর খোঁজ নিয়ে যেত ওদের। কখনও মোরগা, কখনও জঙ্গলের মধ্যে থেকে শিকার করা শম্বর বা শুয়োরের মাংস, কখনও আঁওলার আচার, লাল আলু, বাখ্‌খরখানি রোটি, কালাকান্দ এবং আরও কত কী পাঠিয়ে দিতেন উনি পিলু-নিলুদের জন্যে।

পিলুর বাবা হঠাৎই মারা গেলেন একদিন জিপ-অ্যাকসিডেন্টে। টেবো ঘাটে বনের মধ্যে কাঠ আনবার জন্যে যে নতুন পথ বানানো হয়েছিল, সেই পথ থেকেই জিপ চাকা হড়কে নীচের গভীর খাদে গড়িয়ে পড়ল। তার কিছুদিন পরই ঠিকাদারি ব্যবসা উঠে গেল ফরেস্ট কর্পোরেশান হয়ে যাওয়াতে।

শ্রীকান্তবাবু ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেলেন নেফাতে। হঠাৎই বড় দুর্দশাতে পড়ল পিলুরা। নিলুর তখন দু'বছর বয়স মোটে। তবুও চালিয়ে নিচ্ছিল পিলু, কিন্তু গতবছর মায়ের হার্ট অ্যাটাক হওয়াতে মা প্রায় শয্যাশায়ীই হয়ে গেলেন। এখন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলেন। পা টেনে-টেনে হাঁটেন বাথরুমে যাওয়ার সময়ে। রান্না অথবা অন্য কোনও কাজই করতে পারেন না। বলেন অবশ্য যে, বসে-বসে রান্নাটা করবেন।

কিন্তু পিলুই দেয় না।

পিলুর বাবা নিজে বেশিদূর অবধি পড়াশুনো করার সুযোগ পাননি, কিন্তু পড়াশুনোতে তাঁর খুবই উৎসাহ ছিল। সব সময় বলতেন পিলু নিলুকে, যখনই ওঁদের কাছে থাকতেন বা ছুটিতে আসতেন বর্ষাকালে,'আমি যা হতে পারিনি, তোরা তাইই হস। বড় হোস বাবা, অনেকদূর অবধি লেখাপড়া করিস। ভাল থাকিস। মানুষ হোস।'

বাবার জ্বর-জারি হলেই খুব কাহিল হয়ে পড়তেন উনি। পিলু যখন পা টিপে দিত ওর বাবার, বাবা ককিয়ে ককিয়ে বলতেন, মানুষ হোস বাবা। সবসময় মনে রাখিস যে, সবচেয়ে আগে চরিত্র, তারপরে পড়াশুনা, তারপর খেলাধুলো। যে মানুষ নয়, তার সব গুণই বৃথা।

ছেলেবেলা থেকেই নিলুটার লেখাপড়াতে বেশি মন নেই। ও বাঁশি বাজায়, বনে বনে ঘুরে বেড়ায়, প্রজাপতি ধরে, কাঠবিড়ালির বাচ্চা পোষে, মুণ্ডা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীপারে লুকোচুরি খেলে। মুণ্ডারি গান গায়। মোষের পিঠে চরে বাঁশি বাজাতে বাজাতে চলে যায় সবুজ মাঠ পেরিয়ে নীল পাহাড়ের গভীরে। ও বলে, ও শহরে যাবে না। পড়াশুনো করবে না।

পিলু নিজে জানে যে, টেস্টে ইচ্ছে করেই সে খারাপ ফল করেছে। ওর মনের মধ্যে এখন যে ঝড়, যে আগুন, তা থামানো বা নিবোনোর সাধ্য ওর নেই। বড়ই সমস্যাতে পড়েছে পিলু।

বজরার রুটি দু'ভাই মিলে হাতে-হাতে গড়ে নিল। লাউকির তরকারি আর গত বছরে মায়ের হাতে বানানো বুনো আমের আচার ছিল। মায়ের খাবার বেড়ে নিয়ে নিজেরাও ঘরে গিয়ে বসল মায়ের পাশে, মেঝেতে। পা ছড়িয়ে মাটির মেঝেতে বসে মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে রাতের খাবার খেয়ে নিল ওরা।

মা যেন কেমন হয়ে গেছেন। হাসেনও না একটু। গরিবিতেও ওদের মনে আনন্দর অভাব ছিল না। কিন্তু অসুখের পরেই মা অন্যরকম মানুষ। ডাক্তার বলেছেন পিলুকে, কখন কী হয় বলা যায় না।

নিলুটা খেতে খেতেই হাই তুলছিল। বলল, "জানিস দাদা। আজকে না তিড়িংকে হুণ্ডারে নিয়ে যাচ্ছিল আর একটু হলে।"

"তাই ? কোথায় ?" আতঙ্কিত গলায় বলল পিলু। এবং মা'ও।

"হ্যাঁ। ঝিংরিঝারির নালার কাছে। একজোড়া মস্তবড় হুণ্ডার এসেছে। ছাগলের বাচ্চাদের মধ্যে তিড়িংটাই দুষ্টু সবচেয়ে বেশি। কেবলই এদিক-ওদিক চলে যায়।"

"বড় হুণ্ডার হলে তোকেও ধরতে পারে। একা-একা যাস না ঝিংরিঝারির দিকে।"

খাওয়াদাওয়ার পর মায়ের পা টিপল পিলু অনেকক্ষণ। নিলু ততক্ষণে মায়ের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে কাদা। পিলুর অনেকই কাজ বাকি। উঠোনের দরজা বন্ধ করবে। মুরগি আর ছাগলদের ঘরে খিল দেবে ভাল করে। বেড়াটা ভেঙে গেছে পশ্চিমের দিকের। রাতে চিতা বা হুণ্ডার বাড়ির মধ্যেই চলে না আসে। বাবা বেশ কয়েক বছর হল গেছেন। সঞ্চয় যা ছিল মায়ের, সবই শেষ। পিলুর ছেলেবেলা বলতে সুখের

কিছুই নেই আর। ছেলেবেলাতেই ও বুড়ো হয়ে উঠেছিল। তবু, মা'কে ও বুঝতে দেয় না যে, ওর কোনও অসুখ আছে। বুঝতে দেয় না ছোট ভাই নিলুকেও।

কাজ শেষ করেই পাশের ঘরে গিয়ে ঘুমোবে ঘণ্টা দুই। হাই ওরও ওঠে। কিন্তু মায়ের সামনে হাই তোলে না, পাছে ওর কষ্ট দেখে মায়ের কষ্ট বাড়ে। দু'ঘণ্টা ঘুমোবার পর উঠে পড়ে লম্ফ জ্বেলে পড়াশুনা করে ও। বাইরে বনের মধ্যের গা-ছমছম রাত তখন গভীর হয়ে আসে। শালবনের পাতা গড়িয়ে পড়ে নীচের ঝোপ-ঝাড়ে, শিশির পড়ার শব্দ ভুতুড়ে ফিসফিসানির মতো শোনায়। নানা রাত-পাখি রাত-পোকা ডাকে। নিশাচর জন্তু-জানোয়ারের পায়ের চাপে পুট্-পাট্ করে মরা-ঝরা ডাল ফাটে। নুড়িতে শব্দ ওঠে খুটখুট। কখনও-সখনও দূর-পাহাড় থেকে আসা বড় বাঘের আওয়াজে গমগম করে ওঠে রাতের বন-পাহাড়। পড়া শেষ করে পিলু ঘুমোয় আবার, ভোরের মোরগার ও ময়ূরের ডাকে জেগে উঠবে বলে।

॥ ৩ ॥

ঘুম ভেঙে গেল। মেঝেতেই বাঁশের চাটাই পেতে শুয়েছিল। গরম পড়লেই সাপের ভয়ে সাবধানে থাকতে হয়। তখন মাটিতে শোওয়া যাবে না। চিতি সাপেরই ভয় বেশি।

শেষ রাতে হঠাৎই ঘুম ভাঙল, বাবাকে স্বপ্ন দেখে। বাবা যেন পিলুর মুখের উপর মুখ নামিয়ে এনেছেন। কী যেন বলতে চাইছেন, কিন্তু বলতে পারছেন না। বারবার চেষ্টা করেও পারলেন না। বাবার যেন কষ্ট হচ্ছে খুব। কম্বল সরিয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ল পিলু।

আজ পূর্ণিমা। শীতের পূর্ণিমায় রুপো থাকে না। আকাশ জঙ্গল সব হাল্কা-তুঁতে হয়ে যায়। শাড়ির মতো রাতকে জড়িয়ে থাকে সেই জ্যোৎস্না। কম্বলটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে মাটির দাওয়ায় এসে দাঁড়াল পিলু। বাড়ির বড় ছেলে ও। বাবা ওকে লেখাপড়া শিখতে, বড় হতে, মানুষ হতে বলেছিলেন। শিক্ষিত হওয়া, বড়লোক হওয়া, বড় হওয়া আর

মানুষ হওয়ার মধ্যে কি কোনও তফাত আছে ? ভাবছিল পিলু। ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ও। ওকে শিক্ষিত হতে হলে, বড় চাকরি করে বড়লোক হতে হলে, মা'কে এখানে ফেলে রেখে টাটাতে গিয়ে কলেজে ভর্তি হতে হবে। বৃত্তি সে পাবেই। থাকা-খাওয়ার খরচ লাগবে না। কিন্তু মা'কে তো নিয়ে গিয়ে রাখতে পারবে না সেখানে। মা'কে এখানে ছেলেমানুষ, পাগলাটে, দায়িত্বজ্ঞানহীন নিলুর ভরসায় যদি রেখে যায়, তা হলে মায়ের যে কী হবে কেউ জানে না। কে মাকে রেঁধে দেবে ? কে ওষুধ এনে দেবে ? ছাগলের দুধ বিক্রি বা মুরগির ডিম বিক্রির বন্দোবস্ত সব কে করবে ? সামান্য জমিতে চাষবাসই বা কে দেখবে ? তার নিজের তো ভালই চলে যাবে শহরে বৃত্তির টাকাতে। টাটা কোম্পানির অনেক আলাদা বন্দোবস্ত আছে ভাল ছেলেমেয়েদের জন্যে। কিন্তু মা ? নিলু ?

কী যে করবে ও তাই-ই ভেবে পাচ্ছে না। এতসব কথা তো মাস্টারমশায়দের বলা যায় না। অথচ এসব শুনলে ওঁরা দুঃখই পাবেন শুধু। কিছু করতেও পারবেন না। ওঁদের নিজেদের সংসারই চলে না। এই সব ভেবেই ও ইচ্ছে করে টেস্ট পরীক্ষাতে খারাপ করেছিল, যাতে ওঁরাই বলেন যে, এ-বছরে তুই বসিস না ফাইনালে পিলু। তোকে স্ট্যাণ্ড করতে হবে।

গত সপ্তাহে শ্রীকান্ত শর্মার বাড়ি গেছিল একবার। উনি ছিলেন না। ওঁর ভাই খুবই খারাপ ব্যবহার করলেন। বললেন, "অনেকই তো নিয়েছ, তোমার বাবা আর তোমরা মিলে আমার দাদার কাছ থেকে। আর কেন ? তংক্ মৎ করো ! যাও !"

মা'কে বলেনি এ-কথা।

তারা-ভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইল পিলু। কী যে করবে ও ! উত্তর পেল না কোনও। তারপর বনকে শুধোল। সেও নিরুত্তর। তারও পর নিজের মনকে শুধোল পিলু এই কঠিন প্রশ্ন। শিশির ঝরছে বনে বনে। মুহূর্ত ঝরে যাচ্ছে শিশিরেরই মতো পিলুর জীবন থেকে। জানে ও কোন্‌টা ঠিক ? কোন্‌টা ভুল ? তা ঠিক করতে ভুল হয়ে গেলে জীবনটাই ভণ্ডুল। আর একটামাত্রই জীবন !

নীরবে পিলু আকূতি করে বলল, "বলো বলো। তোমরা বলে দাও আমাকে কী হব আমি ? জীবনে কী হব ? কী করব ?" হনুমানের দল দূরের গহিন বনের গাছে গাছে ঝাঁপাঝাঁপি করে ডেকে উঠল। হঠাৎই উত্তরটা ছুঁড়ে দিল তাকে বনের নীলচে ভেজা শীতজ্যোৎস্নাকে শাড়ির মতো পেঁচিয়ে-পরা নীলাভ অন্ধকার। বলল, "পিলু অন্য সবকিছু হওয়ার চেয়েই মানুষ হওয়া অনেক বেশি কঠিন। শিক্ষিত হওয়া সোজা, টাকা রোজগার করা সোজা, যশস্বী হওয়া সোজা, কিন্তু মানুষের মতো মানুষ হওয়া সবচেয়ে কঠিন। পিলু, তুমি তোমার মাকে ছেড়ে যেও না। তুমি চলে গেলে তোমার মা ভেসে যাবেন। মরে যাবেন দু-একমাসের মধ্যেই।

"মানুষ হোয়ো পিলু। মানুষের চেহারায় কোটি কোটি জীব আছে। কিন্তু মানুষের মতো মানুষ বড়ই কম এখানে।"

পিলুর মনে পড়ে গেল, বাবা বলতেন, 'চরিত্র'। চরিত্র সবচেয়ে আগে, তারপর সবকিছু। এই মানুষ হওয়ার আরেক নামই কি চরিত্র ?

পিলু দু'ঘরের মধ্যের দরজা দিয়ে মায়ের ঘরে গিয়ে মা'কে জড়িয়ে ধরল। মায়ের ছেঁড়া লেপের তলায় ঢুকে গেল ও। মায়ের গায়ের গন্ধ-মাখা ওমে নাক ভরে গেল। বাইরে তখন অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। পাখপাখালি নড়ে-চড়ে বসছে। জেগে উঠছে পৃথিবী ; ধীরে ধীরে।

মা চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কী হয়েছে রে পিলু ? কী হয়েছে ?"

পিলু বলল, "আমার বড় আনন্দ হচ্ছে মা, জানো ! খুবই আনন্দ হচ্ছে।"

"কেন ? আনন্দ'র কী হল হঠাৎ ? এই সাতসকালে ?" জড়িয়ে জড়িয়ে মা বললেন।

পিলু উত্তর দিল না কোনও।

মা বললেন, "কী হল রে ? পিলু ?"

পিলু তবু কিছু বলল না।

"বলবি না আমাকে ? এ কেমন আনন্দ যে, মা'কেও বলা যায় না ?"

"নাঃ। না মা। বলা যায় না। এই আনন্দের কথা শুধু আমারই জানবার। আমার একার।"

মনে মনে বলল, 'সব কথা বলার জন্যে নয়।'

মা বললেন, "কী জানি ! বুঝি না তোকে। পাগল একটা।" বলেই, কাঁপা-কাঁপা হাতখানি নিয়ে পিলুর মাথায় রাখলেন।

একটু পরে পিলু বলল, "সকাল হল। এবারে উঠি মা। তোমার আর আমার জন্যে চা করি। নিলুর দুধ ফোটাতে হবে। ছাগল দুইতে হবে। আকোয়া-ভাইকে খবর দিতে হবে বয়েল দুটোর জন্যে। অনেকই কাজ।"

পিলু যখন বাইরে এসে দাঁড়াল তখন রোদ উঠে গেছে। সকালের রোদ পড়ে ঝলমল করছে লক্ষ কোটি শবনম্ পাতায় পাতায়, ঝোপে-ঝাড়ে ; ঘাসে-ঘাসে। শিশিরের হিরে ঝরিয়ে দিয়ে একটি বুলবুলি উড়ল ভেজা গাছের পাতলা ডালে দোলা দিয়ে। শিস দিতে দিতে চলে গেল পুবে। রোদে পিঠ দিয়ে দাওয়ায় দাঁড়িয়ে পিলু ভাবছিল, টাটাতে গিয়ে পড়তে পারবে না ও ? কত কীই না ভেবেছিল ! ডাক্তার হবে, মস্ত ডাক্তার।

হল না হওয়া।

কিন্তু নিজেকে কষ্ট দেওয়ার মধ্যে যে এতখানি আনন্দও থাকতে পারে, তা কখনওই পিলুর জানা ছিল না। নিজেকে ঠকানোর আনন্দে বুক ভরে গেল। কে জানে ! যে নিজেকে ঠকায়, হয়তো সেইই জেতে আসলে।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চলো যাই ঘুমের দেশে

কবিতা সিংহ

রাতের বেলা দিদা মিতুলের চুল আঁচড়ে দিচ্ছিলেন। মিতুল খাটের উপর দাঁড়িয়ে দিদার মাথায় হয়েছে। মিতুল দিদার সিঁথির পাশের একগোছা পাকা চুলের দিকে তাকিয়ে বলল, "দিদা, তোমার চুল এমন সাদা কেন ? আর আমার চুল এমন কালো কেন ?"

মিতুলের দিকে তাকিয়ে দিদা বললেন, "আমি যে বুড়ি, আর তুমি যে কচি !"

মিতুল আবার বলল, "তুমি অত উঁচু কেন ? আমি এত নিচু কেন ?"

দিদা আবার হাসলেন, "নিচু না, তুমি ছোট।"

মিতুল বলল, "ও, বুঝেছি, আমি ছোট্ট লোক, আর তুমি মস্ত লোক !"

দিদা বললেন, "না, না, ও কথা কক্ষনো বোলো না সোনা। তুমি, ওই যে বাগানে, যে ছোট্ট-ছোট্ট গাছ, ওদের মতো। তুমি সবে পাঁচ হয়েছ, আর আমি অনেক অনেক বছর রয়েছি। তুমি পাঁচ বছরের আর আমি পঞ্চাশ বছরের।"

দিদার এত কথার পরও মিতুলের বকবকানি থামে না।

"আচ্ছা দিদা, আমি তো বাইরে কোথাও যাব না, এখন শুতে যাব, তবে তুমি আমার মাথা আঁচড়ে দিচ্ছ কেন ?"

দিদা এবার একটু মুশকিলে পড়লেন। যাই হোক, মুশকিলটা কাটিয়ে উঠে দিদা বললেন, "আরে ! তুমি জানো না মিতুল, এখন তো তুমি ঘুমের দেশে বেড়াতে যাবে। ঘুমের দেশে চুল না আঁচড়ে তো যেতে নেই।"

মিতুল বলল, "তা হলে আমার নতুন জামাটাও পরিয়ে দাও। আর সেই ঘুন্টি-বাঁধা জুতো-জোড়া।"

দিদা বললেন, "এ কী ! তুমি জানো না ঘুমের দেশে রাত-পোশাকই তো আসল বেড়াবার পোশাক। গোলাপি পশমি রাত-পোশাকে তোমাকে পরির মতো লাগছে ! আর জুতো ? ঘুমের দেশে তো মাটিই নেই, তুমি তবে জুতো পরবে কেন সোনা !"

মিতুল ভুরু তুলে বলল, "তবে ঘুমের দেশে কী আছে ?"

"আকাশের তাল-তাল ননির দলা, মেঘের মতো রঙিন-রঙিন হালকা তুলোর বলের মতো, থাকে-থাকে সাজানো, আমাদের মনের ভিতরে মিষ্টি-মিষ্টি ঘুম-ঘুম কল্পনা,

আর স্বপ্ন। তারই উপর পা দিয়ে-দিয়েই তোমায় যেতে হবে।"

মিতুল বলল, "তুমি কখনও ঘুমের দেশে গেছ দিদা ?"

দিদার দীর্ঘশ্বাস পড়ল একটা। ঢোক গিলে দিদা বললেন, "গেছি, কেমন জায়গা সেই ঘুমের দেশ ?" দিদা মিতুলকে শুইয়ে গায়ে লেপ টেনে দিয়ে, বড় আলোটা নিভিয়ে সবুজ বেডল্যাম্প জ্বেলে দিয়ে বললেন, "খুব সুন্দর !"

"কেমন সুন্দর, একটু বলো না।"

দিদা বললেন, "কত দুধের নদী, কত ক্ষীরের সায়র। সাদা ধপধপে রাজহস্তী সেই দুধ সমুদ্রে বসে ফোয়ারার মতো দুধ ছিটোচ্ছে, মাথায় তার গজমোতি ঝলমল করছে। কত ক্ষীরের পুতুল সেই দুধ-সমুদ্রের ধারে। তারপর মস্ত উঁচু হাড়ের পাহাড় পেরিয়ে, ডালিমকুমারের দেশ ছাড়িয়ে লালকমল নীলকমলের রাজ্যি, সেই রাজ্যের পারে তেপান্তরের মাঠে সুখু-দুখুর দেশ। ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমির ছোট্ট ছানার পিঠে চড়ে উড়ে গেলাম চাঁদের মা বুড়ির দেশে। সেখানে দেখা অমলার সঙ্গে, তার সঙ্গে গেলাম আজব দেশে··· কিন্তু মিতুল, আজকাল আমি আমার সেই ঘুমের দেশের ঠিকানাটাই হারিয়ে ফেলেছি !"

ঘুম-জড়ানো গলায় মিতুল বলল, "দিদা, তোমার রাত-পোশাকের কী রঙ ছিল দিদা ?"

দিদার চোখের ঝিনুক দুটি অন্ধকারে স্মৃতির অশ্রুতে টুবু-টুবু হয়ে উঠল। দিদা বললেন, "আমার দিদিমা তাঁর পুরনো সাদা থান দু'পাট করে কাঁচি দিয়ে কেটে হাতে নরম সেলাই করে নরম নরম রাত-পোশাক বানিয়ে আমাকে দিতেন। আমি তাই পরতাম। সেগুলো খুব নরম আর মিষ্টি হত।"

ঘুম-জড়ানো গলায় মিতুল বলল, "আচ্ছা দিদা, চলি।"

দিদা মিতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মিতুলের চোখের পাতা দুটি ঘুমে ভারী হয়ে নেমে এসেছে। তার সবুজ আলো-মাখা গাল দুটিতে বড় বড় চোখের পল্লবের ছায়া পড়েছে। দিদা নরম গলায় বললেন, "কোথায় ?"

মিতুল থেমে-থেমে বলল, "ঘুমের দেশে !"

পরদিন সকাল বেলা দিদার ঘুম ভাঙল মিতুলের ডাকে। চোখে চোখ পড়তেই দুষ্টু-দুষ্টু হেসে মিতুল বলল,"কী দিদা, কাল কীরকম মজা হল ?"

দিদা তার গোলাপি গাল দুটির দিকে এবং তার কৌতুকোজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কিসের মজা ?"

"আহা যেন জানো না ! কাল ঘুমের দেশে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল না ?"

দিদা বললেন, "হয়েছিল বুঝি ?"

দিদার ঠোঁটে তখন কৌতুকের হাসি ফুটে উঠল। মজার খেলাটা শুরু করে দিয়ে দিদা ভেবেছিলেন কল্পনায় মিতুলকে হারিয়ে দেবেন।

কিন্তু তা সম্ভব হল না বোধহয়। মিতুলের কাছে দিদার হেরে যেতে খুব ভাল লাগছিল।

মিতুল বলল, "ঘুমের দেশে আগাগোড়া তো লজেন্সের রাস্তা। তারপর কোল্ড ড্রিংকের কত্ত ফোয়ারা। কত রোবট-পুলিশ রাস্তায় হাত দ্যাখাচ্ছে। কী ভাল-ভাল সব রিমোট কন্ট্রোলের গাড়ি। জানো দিদা, ওখানে আমার অনেকগুলো স্পেস-নৌকো ছিল। লাল নীল হলদে সাদা। ওগুলো ভাসছিল চকোলেটের সমুদ্রে। তোমায় দেখলাম সাত ভাই চম্পার বাগানে। তোমাদের ঘুমের দেশের একেবারে শেষে ওই বাগানটা। তুমি একা-একা দোলনা দুলছিলে। প্রোফেসর শঙ্কু তাঁর একটা 'পাসট্ প্রজেকশন' মেশিনে তোমাকে দেখালেন বললেন, 'ওই যে তোমার দিদা।'

"আমি তোমায় তখন আমার ঘুমের দেশে নিয়ে এলাম হাত ধরে। তোমারটাও দেখে এলাম। তারপর বললাম, ও দিদা চলো তোমায় আমার স্পেস-নৌকোয় তুলে নীহারিকার দেশে নিয়ে যাই। আসলে তোমাকে আমার 'কসমস' থেকে তুলে একটা বাচ্চা তারা প্রেজেন্ট করার ইচ্ছে ছিল।"

দিদার চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় হয়ে গেল। দিদা শুধোলেন, "তারপর আমাকে তোমার সেই স্পেস-নৌকোয় তুলে নিলে ? কতটুকু সেই নৌকো ?"

"ছোট্ট। আমাদের মতো দুটো মানুষ যাতে যেতে পারে !"

দিদা ভুরু দুটো তুলে বললেন, "সে কী ! আমি তো তোমার মতো ছোট নয়। আমি তো মস্ত বড়।"

মিতুল বলল, "আহা, ঘুমের দেশে তোমার বয়স তো আমার চেয়েও ছোট। এই পাকা চুলও নেই। এই তোবড়ানো গালও না। এত লম্বাও না তুমি, আমার চেয়েও ছোট্ট। দিব্যি দুটো পুট্‌কি-পুট্‌কি বিনুনি করা। বিনুনির মাথায় ফিতের ফুল। সাদা রাত-পোশাক। কাঁধে মস্ত একটা তারা। ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। আমিই তো ওই বাচ্চা তারাটা তোমার কাঁধে লাগিয়ে দিলাম। ও দিদা, তুমিও ছোটবেলা খুব মিষ্টি ছিলে। শ্যামলা ছিলে অবশ্য, কিন্তু মিষ্টি !"

মিতুলের চোখের মণিতে দিদা এক পলকের জন্য যেন নিজের হারিয়ে যাওয়া ছবিটাকে দেখতে পেয়ে গেলেন।

ছবি : দেবাশিস দেব

আট-পা'ওয়ালা প্রাণী

মৃণালকান্তি দাশ

তোমরা যারা জুলে ভের্নের 'টুয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্স আণ্ডার দ্য সি' ছবিটি দেখেছ, তাদের নিশ্চয়ই মনে আছে ক্যাপ্টেন নিমো আর তাঁর অতিকায় সাবমেরিন 'নটিলাস'কে। নিমো আর নটিলাসকে মনে থাকলে, কখনওই ভুলতে পারবে না এক দানবাকৃতি অক্টোপাসের সঙ্গে যুদ্ধের দৃশ্যটি।

অক্টোপাস কথাটার মধ্যে রয়েছে দুটি শব্দ। এর প্রথম শব্দটির অর্থ হল আট, আর দ্বিতীয় শব্দটির অর্থ পা। সব মিলিয়ে অক্টোপাসের অর্থ তা হলে দাঁড়াচ্ছে আট-পা'ওয়ালা প্রাণী।

সাধারণভাবে বলতে পারি, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নানা সমুদ্রে অক্টোপাসের দেখা পাওয়া যায়। প্রাণীবিজ্ঞানে শামুক, গুগলি, ইত্যাদির সমগোত্রভুক্ত অক্টোপাসের হিংস্রতা সম্পর্কে যত আজগুবি গল্পই প্রচলিত থাক, অনেক সমুদ্রতত্ত্ববিদের মতে প্রাণীটি কিন্তু ততটা ভয়ঙ্কর নয়। এ পর্যন্ত যত ঘটনা বা দুর্ঘটনার খবর পাওয়া গেছে, তার বেশির ভাগই ঘটেছে তাদের উত্যক্ত করার জন্য, নয়তো ভয় পেয়েই তারা অমন কাণ্ড বাধিয়েছে। অক্টোপাসের স্বভাবই হল কোনও সচল প্রাণী বা বস্তু দেখলেই তার পিছনে ধাওয়া করা। আসলে অক্টোপাসের ওইরকম আট-শুঁড়বিশিষ্ট কিম্ভূতকিমাকার চেহারা দেখলে অনেক জীবপ্রেমিকও তাকে 'খুনে' আখ্যা দিয়ে বসবেন, আমরা তো কোন্ ছার!

অক্টোপাসের শরীর বেশ নরম। এদের আটটি বাহু বা শুঁড়ের ভিতরেই দু' সারি করে যে গোলাকার মাংসপেশি আছে, সেগুলি বায়ুশোষকের কাজ করে। অক্টোপাসের আট বাহুর ভিতরে বাঁধা পড়ে আক্রান্ত জীব যদি প্রাণ বাঁচাতে ছটফট করে, অমনি অক্টোপাস তার বায়ুশোষকের সাহায্যে শুঁড়ের ভিতরের অংশকে বায়ুশূন্য করে ফেলে। এর ফলে শুঁড়গুলি আরও বেশি শক্ত হয়ে যায়। তখন অক্টোপাসের কবল থেকে আক্রান্ত জীবটির ছাড়া পাওয়ার কোনও আশাই থাকে না।

একটি অক্টোপাসের আকার দু' ইঞ্চি থেকে আঠারো ফুট পর্যন্ত হতে পারে। দু'দিকে ছড়ানো বাহুর দৈর্ঘ্য তিরিশ ফুট বা কুড়ি হাত। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে কোনও-কোনও জাতের অক্টোপাসের বাহু বা শুঁড়ের দৈর্ঘ্য ষোল থেকে আঠারো ফুট পর্যন্ত হতে দেখা গেছে।

শিকার করার সময় বা শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য অক্টোপাস এক ধরনের মুখনিঃসৃত লালার সাহায্য নেয়। নীল রঙের এই লালা আক্রমণকারী বা

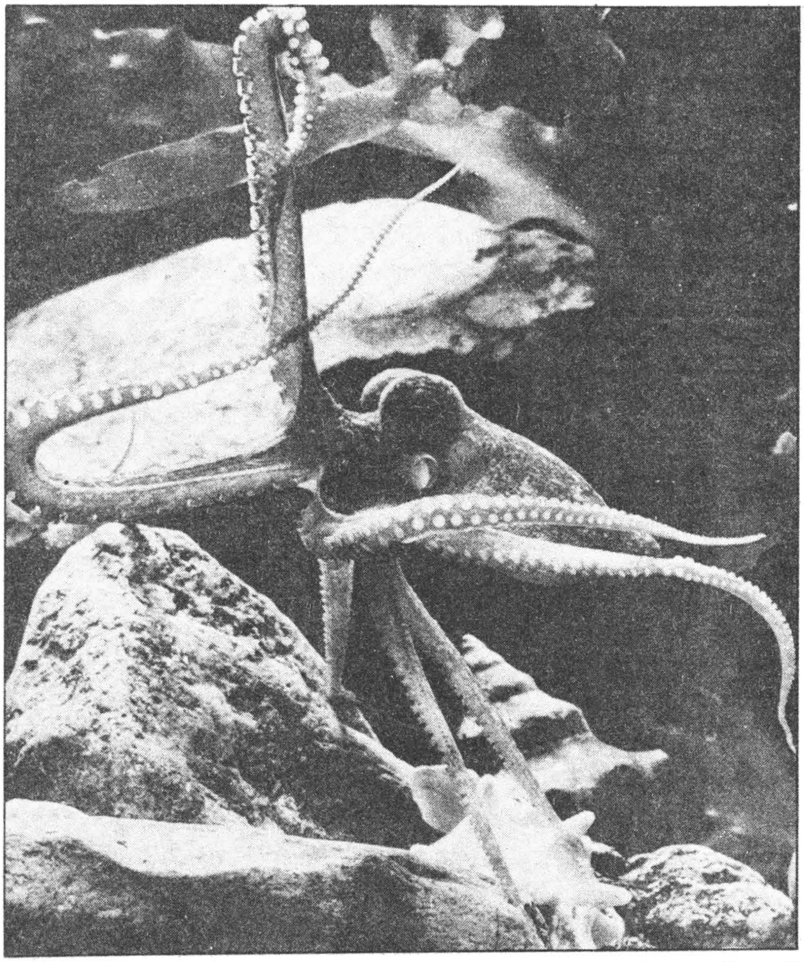

শিকারকে বিভ্রান্ত করে দেয়। লালার প্রভাবে শিকার বা আক্রমণকারী জীবটির অনুভূতিসম্পন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে যায়। সমুদ্রজগতে অক্টোপাসের মতো বুদ্ধিমান এবং শিকারে পটু প্রাণী খুব কমই আছে।

আটটি শুঁড় দিয়ে জড়িয়ে ধরা, নীল রঙের লালা ছিটিয়ে দেওয়া ছাড়াও অক্টোপাসের আর-একটি মোক্ষম অস্ত্র হল তার পেটের কাছে লুকোনো টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকা ধারালো ঠোঁট। এই ঠোঁটে মারাত্মক বিষ। শুধু ঠোঁটের কামড়ে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

সাধারণত উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের সমুদ্রে অক্টোপাসের দেখা পাওয়া যায়। মা-অক্টোপাস একসঙ্গে অনেকগুলি ডিম পাড়ে। এক-একটি ডিমের আকার এক ইঞ্চির আট ভাগ। ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোতে সময় লাগে চার থেকে আট সপ্তাহ। ওই সময়টা মা-অক্টোপাস ডিমগুলি পাহারা দেয়। কোনও খাবার মুখে পর্যন্ত তোলে না। ডিম পাহারা দেওয়ার সময় কোনও প্রাণী আক্রমণ করলে মা-অক্টোপাস ডিমগুলি নিজেই ফাটিয়ে দেয়, আর অমনি শিশু-অক্টোপাসগুলি নিরাপদ দূরত্বে চলে যায়।

অক্টোপাসের প্রিয় খাদ্য কাঁকড়া, চিংড়িমাছ আর জলজ জীবাণু।

সমুদ্রজগতে এখনও পর্যন্ত মোট দেড়শো জাতের অক্টোপাসের খোঁজ পাওয়া গেছে।

গোলমাল

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : হরিবাবুকে পঞ্চানন্দ জানায়, সে তাঁর স্বর্গত পিতা উদ্ভটবিজ্ঞানী শিবু হালদারের কাছ থেকে আসছে। সে নাকি তাঁর শাকরেদ ছিল। হরিবাবুকে সে একটা পুরনো চাবি দিয়ে বলে, "ঈশান কোণ, তিন ক্রোশ।" হরিবাবুর ছোট ভাই ন্যাড়া কুস্তি শেখে গজ-পালোয়ানের কাছে। আর এক ভাই জরিবাবু শেখেন কালোয়াতি গান। হরিবাবুর দুই ছেলে ঘড়ি ও আংটির খেলা দেখে যে-মহারাজা তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে চেয়েছিলেন, বাসের মধ্যে খুন হয় তাঁর সেক্রেটারি। গজ'র ডেরা চক-সাহেবের পোড়োবাড়িতে ঢুকে যে-লোক মারা যায়, তার লাশ মেলেনি। সেক্রেটারির লাশও বেপাত্তা। মধ্যরাতে শিবুবাবুর ল্যাবরেটরিতে মূল্যবান কিছুর খোঁজে ঢুকেছিল গজ ; তিন অতিকায় মূর্তি তাকে বন্দী করে। চক-সাহেবের বাড়িতে উঁকি মেরে পঞ্চানন্দ যাকে দেখতে পায়, তার ক্ষমতা সীমাহীন। হরিবাবু ছাতে উঠে নীল চাঁদ দেখে কবিতা লেখেন। পঞ্চানন্দ বলে, সেটা উড়ন্ত চাকি। চক-সাহেবের বাড়িতে যাবার পথে সে আক্রান্ত হয়। ঢ্যাঙা আততায়ীকে ঘায়েল করে সেই তিনটে অতিকায় লোক ; গজকে যারা আটকে রেখেছে। বিদ্যুতের বেড়া অপসৃত হয়েছে বুঝে এগিয়ে যেতেই কাঁকড়াবিছের কামড় খায় গজ ; তারপর খানিক হেঁটে এক জলায় বেহুঁশ পড়ে যায়। জ্ঞান ফিরে পেয়ে পঞ্চানন্দও খানিক এগিয়ে গজ'র খোঁজ পায়। কিন্তু গজ'র ছিপছিপে শরীর ইতিমধ্যে হাতির মতন হয়ে গেছে। উড়ন্ত চাকি দেখে ঘড়ি আর আংটিও বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। চক-সাহেবের বাড়িতে ঢুকে আংটি ঘুম লাগায়। ঘড়ি যে কাঁকড়াবিছেটাকে জুতোর তলায় চেপে ধরে, সেটা যান্ত্রিক। এদিকে আংটি সন্ধান পায় প্রথমে সেই মহারাজার 'মৃত' সেক্রেটারির, পরে স্বয়ং মহারাজার। মহারাজা বলেন, অন্য নক্ষত্র-মণ্ডলের লোকেরা পৃথিবীকে চুরি করতে চায়। হরিবাবু ইতিমধ্যে ল্যাবরেটরিতে একটা গোলকের খোঁজ পেয়েছেন। আর আংটি জেনেছে, মহারাজা আসলে ভিন্-গ্রহের মহাশক্তিধর রামরাহা। গোলক-হাতে বেরিয়ে হরিবাবু ইতিমধ্যে ভিন্-গ্রহের মানুষদের জাহাজে বন্দী হন। সেখানে তাঁর পরিচিত অনেকেও আছেন। রামরাহা আর আংটিও এখন জাহাজে। পৃথিবীকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা চলছে। তারপর···

কোন্ দিকে যেতে হবে, কোথায় খুঁজতে হবে, তার কিছুই জানে না আংটি। তবু অন্ধের মতো সে ছুটতে চেষ্টা করল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, রামরাহা দৈত্যটাকে স্রেফ দু'হাতে ধরে ওয়েটলিফটার যেমন মাথার ওপর ভার তুলে দাঁড়ায় তেমনি তুলে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। দৈত্যটা অসহায়ের মতো হাত-পা ছুঁড়ছে।

দানবদের মহাকাশযান তাদের আকারেই তৈরি। মস্ত মই, মস্ত বড় সব যন্ত্রপাতি, বিশাল সব কুঠুরি। তার মধ্যে মেলা অলিগলিও আছে। কোন্ দিকে যাবে তা আংটি বুঝতে পারছিল না। সামনে যে পথ বা সিঁড়ি পাচ্ছে, তাই দিয়ে এগোচ্ছে বা উঠছে। এক জায়গায় ভারী কাঁচ লাগানো গোল একটা জানালা দেখতে পেয়ে কৌতূহল চাপতে পারল না আংটি। উঁকি দিয়ে সে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল। কুচকুচে কালো আকাশে এক অতিশয় উজ্জ্বল সূর্য জ্বলজ্বল করছে। একটু দূরে এক নীলাভ সবুজ বিশাল গ্রহ। গ্রহটাকে চিনতে অসুবিধে হল না আংটির। তাদের আদরের পৃথিবী। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আফ্রিকা, দক্ষিণ ভারত, এশিয়া, আরব সাগর, ঠিক যেমন মানচিত্রে দেখেছে। পৃথিবী যে কত সুন্দর তা প্রাণ ভরে আজ উপলব্ধি করল আংটি। চাঁদকে দেখতে পেল সে। আবহমণ্ডলহীন আকাশে গ্রহনক্ষত্র চৌগুণ উজ্জ্বল হয়ে ফুটে আছে। মহাকাশে যেসব শারীরিক অসুবিধে বোধ করার কথা, তার বিশেষ কিছুই টের পাচ্ছিল না আংটি। তবে মাঝে-মাঝে গা গুলোচ্ছে আর কানে তালা লাগছে।

সুন্দর পৃথিবীর দিকে চেয়ে আংটি চোখের জল মুছল। এমন সুন্দর গ্রহকে ধ্বংস হতে দেওয়া যায় ? রামরাহা অপেক্ষা করছে। তাকে গোলকটা উদ্ধার করতেই হবে।

আংটি সামনেই একটা লোহার মই পেয়ে উঠতে লাগল। ওপরে একটা গলি পথ। আংটি গলি ধরে খানিক দূর এগিয়ে একটা ধাতুর তৈরি বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজায় হাতল নেই, নব নেই। একেবারে লেপাপোঁছা।

আংটি দরজায় কান পেতে শোনার চেষ্টা করল।

ভিতর থেকে মৃদু সব যান্ত্রিক শব্দ আসছে। দু-একটা দুর্বোধ কথাবার্তা। আংটির কাছে সবটাই দুর্বোধ। আংটি কী করবে তা বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইল। দানবেরা যে খুবই উন্নত মানের বিজ্ঞানী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। নইলে পৃথিবীর মতো বিশাল একটি গ্রহকে সূর্যের পরিমণ্ডল থেকে ছিঁড়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনাও যে অসম্ভব ! কিন্তু মস্ত বিজ্ঞানী হলেও তারা মানুষের মতো নয়। কোথাও যেন বাস্তববোধ এবং সাধারণ বুদ্ধির একটু খামতি আছে।

এতক্ষণ নিশ্চয়ই রামরাহাও চুপ করে বসে নেই। সেও একটা কিছু করছে। কিন্তু যে যাই করুক গোলকটা হাতে না পেলে সবই পণ্ডশ্রম। একটু বাদেই দানবদের মহাকাশযান থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে ভয়ংকর সব চার্জ-এ বিস্ফোরণ ঘটানো হবে। তারপর আলোর চেয়েও বহু-বহুগুণ গতিবেগে দানবেরা ছুটতে থাকবে তাদের নিজস্ব গ্রহমণ্ডলের দিকে।

আংটি দরজাটার গায়ে হাত বুলিয়ে দেখল। মসৃণ। খুবই মসৃণ এক ধাতু দিয়ে তৈরি। অনেকটা সোনার মতো রঙ। তবে বেশি উজ্জ্বল নয়।

"এখানে কী করছিস ?"

চাপা গলায় এ-কথা শুনে আংটি চমকে উঠল। অবাক হয়ে চেয়ে দেখল, তার পিছনে ঘড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

আংটি মস্ত একটা শ্বাস ফেলে বলল, "দাদা ! তুই কী করে উঠে এলি ?"

"গজদার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে। রামরাহা তুলে নিল।"

"রামরাহা কোথায় ?"

"ধারেকাছেই কোথাও আছে। এই ঘরটার মধ্যে কী হচ্ছে ?"

"বুঝতে পারছি না। তবে কথাবার্তার শব্দ শুনছি। তোর হাতে ওটা কী ?"

ঘড়ি নিজের হাতের রুমালের পুঁটুলির দিকে চেয়ে বলল,

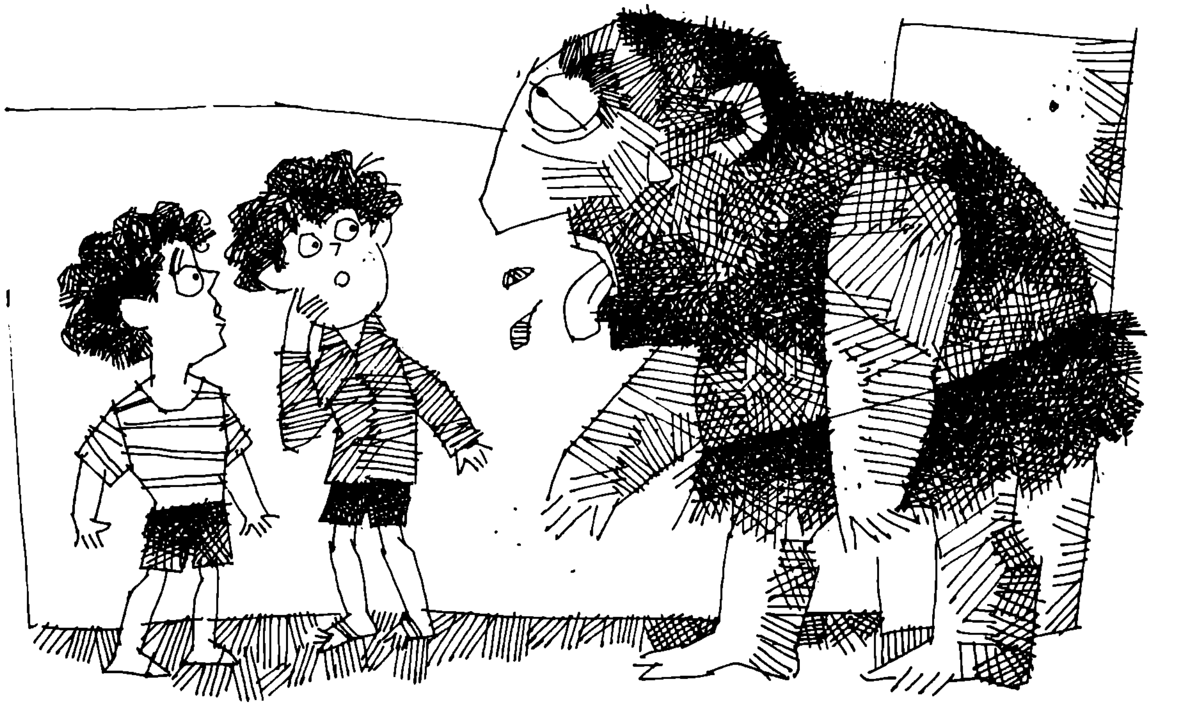

"একটা কাঁকড়াবিছে।"

"কাঁকড়াবিছে! কোথায় পেলি?"

"সে অনেক কথা। তবে এটা খুব সহজ জিনিস নয়। দেখবি?"

ঘড়ি রুমালটা মেঝেয় রেখে রুমালের গিঁট খুলে দিল। সবুজ রঙের বিছেটা ঝিম মেরে রয়েছে। একটা সুগন্ধে চারদিক ভরে যেতে লাগল। এত সুন্দর গন্ধ যে ঘুমিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে।

দুই ভাই হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল, কাঁকড়াবিছেটা একটা ডিগবাজি খেয়ে আস্তে-আস্তে দরজাটার দিকে এগোতে লাগল। দরজার তলার দিকে সামান্য একটু ফাঁক রয়েছে। আধ সেন্টিমিটারেরও কম। বিছেটা কিন্তু ধীরে-ধীরে গিয়ে সেই ছোট্ট ফাঁকের মধ্যে নিজের শরীরটা ঢুকিয়ে দিল। তারপর সুট করে ঢুকে গেল ভিতরে। ঘড়ি ওটাকে আটকানোর চেষ্টা করল না দেখে আংটি বলল, "যেতে দিলি কেন?"

"দেখা যাক না, কী করে।"

দুই ভাই দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চারদিকটা খুব ভাল করে লক্ষ করল। দেখার মতো কিছুই নেই। মেঝে দেয়াল ছাদ সবই মসৃণ ধাতুর তৈরি। ওপরে সারি-সারি পাথরের স্নিগ্ধ আলো জ্বলছে।

দরজাটা যে খুব ধীরে-ধীরে খুলে যাচ্ছে, এটা প্রথম লক্ষ করল আংটি। সে শিউরে ঘড়ির হাত চেপে ধরল। দরজাটা খুলছে খুব অদ্ভুতভাবে। নীচে থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে থিয়েটারের ড্রপস্ক্রিনের মতো।

খোলা দরজার ওপাশে মস্ত একখানা ঘর। তীব্র আলো জ্বলছে। হাজার রকমের কনসোল, যন্ত্রপাতি, শব্দ। খোলা দরজা দিয়ে টলতে টলতে একজন দানব বেরিয়ে এল। তার মুখের করুণভাব দেখেই বোঝা যায় যে, সে সুস্থ নয়। জিভ বেরিয়ে ঝুলে আছে। গলা থেকে একটা গোঙানির শব্দ আসছে।

আংটি শিউরে উঠে বলল, "দাদা!"

ঘড়ি হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "ভয় পাসনি। এটা ওই কাঁকড়াবিছের কাজ।"

দানবটা তাদের দেখতে পেয়ে একটু থমকাল। কোমরের দিকে হাত বাড়াল। কিন্তু যে জিনিসের জন্য হাত বাড়িয়েছিল তা ছোঁওয়ার আগেই ঘড়ি লাফিয়ে পড়ল তার ওপর। দুর্বল দানবটা ঘড়ির দুটো ঘুসিও সহ্য করতে পারল না। গদাম করে পড়ে গেল মেঝের ওপর। ঘড়ি তার কোমরের বেল্ট থেকে একটা ছোট্ট লাইটারের মতো যন্ত্র খুলে নিল।

আংটি বলল, "ওটা কী রে?"

"জানি না। তবে কাজে লাগতে পারে। আমরা না পারি, রামরাহা কাজে লাগাবে। এখন আয়, ভিতরটা দেখি। হামাগুড়ি দিয়ে আসবি কিন্তু।"

দুই ভাই হামাগুড়ি দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। চারদিকে যা তারা দেখছে তার কিছুই তারা কস্মিনকালেও দ্যাখেনি। চারদিকটায় এক যান্ত্রিক বিভীষিকা। তারই ফাঁকে-ফাঁকে এক-আধজন দানবকে মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। কোনওদিকে দৃকপাত নেই।

আংটি কাঁকড়াবিছেটাকে আবিষ্কার করল একটা টেবিলের নীচে। ঝিম মেরে পড়ে আছে। সে ঘড়িকে একটা খোঁচা দিয়ে বিছেটাকে দেখাল।

ঘড়ি টপ করে বিছেটার হুলের নীচে দু'আঙুল দিয়ে ধরে সেটাকে তুলে নিল হাতের তেলোয়। তারপর চাপা গলায় বলল, "এটা মাঝে-মাঝে নেতিয়ে পড়ে কেন ভেবে পাচ্ছি না।"

বলে সে চিত করে বিছেটার বুকের কাছটা দেখল। ছোট-ছোট সব বোতামের মতো জিনিস রয়েছে। একটার রং লাল। ঘড়ি সেটা একটু চাপ দিতেই ক্লিক করে একটু শব্দ। তারপরই বিছেটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। ঘড়ি কাছাকাছি যে দানবটার পা দেখতে পাচ্ছিল, সেটার দিকে মুখ করে মেঝেয় ছেড়ে দিল বিছেটাকে। অমনি বিছেটা একটা দম-দেওয়া

খেলনাগাড়ির মতো বেশ দ্রুত বেগে সেই পা লক্ষ করে এগিয়ে গেল।

যন্ত্রপাতির প্রবল শব্দের মধ্যেও দানবটার চাপা আর্তনাদ শুনতে পেল তারা। দানবটা উঠে দাঁড়াল, তারপর থরথর করে কেঁপে পড়ে গেল মেঝেয়। তারপর উঠে টলতে-টলতে দরজার দিকে রওনা হল।

ঘড়ি সময় নষ্ট করল না। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দানবটাকে টেনে মেঝেয় ফেলে তার মুখে দুখানা ঘুসি বসিয়ে দিল দ্রুত পরপর। এই দানবের কোমরে পাওয়া গেল ডটপেনের মতো একটা বস্তু। ঘড়ি সেটাও খুলে নিল।

আংটি দানবটার শরীর হাতড়ে বলল, "গোলকটা এর কাছে নেই।"

ঘড়ি কাঁকড়াবিছেটাকে আবার তুলে চালু করে ছেড়ে দিল।

একটু বাদেই আবার এক দানব একইভাবে আর্তনাদ করে উঠল।

কিন্তু এবার ঘড়ির কাজটা আর সহজ হল না। হঠাৎ অন্য তিন-চারজন দানব একসঙ্গে ফিরে তাকাল ভূপাতিত দানবটার দিকে। তারপর ছুটে এল সকলে।

প্রথমেই ধরা পড়ে গেল ঘড়ি। একজন দানব একটা থাবা মেরে তাকে তুলে নিল বেড়ালছানার মতো।

আংটি একটু আড়াল পেয়ে গিয়েছিল। তার সামনে একটা বাক্সের মতো জিনিস। বাক্সের একটা ডালাও আছে। আংটি চিন্তাভাবনা না করে ডালাটা তুলে ভিতরে ঢুকে পড়ল। তারপর ডালাটা আস্তে করে নামাল। ঘড়ির কী হল তা সে বুঝতে পারল না।

বাক্সের মধ্যে ঘোর অন্ধকার। হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে চারদিকটা দেখল আংটি। আংটির হিসেবমতো দানবেরা ছ-সাতজনের বেশি নেই। একজনকে রামরাহা জব্দ করেছে। বাকি তিনজন বিছের কামড়ে কাহিল। খুব বেশি হলে আর দু-তিনজন দানবের মহড়া নিতে হবে। ভেবে বুকে একটু বল এল আংটির। খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে খুব সন্তর্পণে ডালাটা ঠেলে তুলল।

ঘরের ছাদের কাছে ক্যাটওয়াকের মতো একটা জায়গায় একজন দানব দাঁড়িয়ে চারদিকে দেখছে। আংটির সঙ্গে তার চোখাচোখি হয়ে গেল। কিন্তু দানবটা তাকে দেখতে পেয়েছে বলে মনে হল না। বাক্সের সামনে মেঝের ওপর লাইটারের মতো জিনিসটা পড়ে আছে। ওটা দিয়ে কী হয় তা জানে না আংটি। কিন্তু মনে হল, কোনও অস্ত্রই হবে। সে যন্ত্রটার দিকে হাত বাড়াল। খুব ধীরে-ধীরে। তার চোখ ওপরে দানবটার দিকে।

শেষ মুহূর্তে একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিল আংটি। যন্ত্রটা তুলতে গিয়ে একটু দ্রুত হাত বাড়িয়েছিল। সেই নড়াটুকু চোখে পড়ে গেল দানবটার। ওই ওপর থেকে দানবটা এক লাফে নীচে নামল।

আংটি যন্ত্রটা তুলে নিয়ে কিছু না বুঝেই দানবটার দিকে সেটা তাক করে ট্রিগার বা ওই-জাতীয় কিছু খুঁজতে লাগল। বুড়ো আঙুলের তলায় আলপিনের মাথার মতো কিছু একটা অনুভব করে সেটায় প্রাণপণে চাপ দিল সে।

চিড়িক করে একটা শব্দ। বুলেট নয়, অন্য কিছু একটা জিনিস ছুটে গেল দানবটার দিকে। দানব কাটা কলাগাছের মতো লুটিয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

অন্য সব দানবেরা চিৎকার করে ছুটে এল।

আংটি বুঝল, লুকিয়ে থাকা বৃথা। সে বাক্সের ডালাটা খুলে বেরিয়ে এসে যন্ত্রটা আর-একজনের দিকে তাক করল। কিন্তু তার হাত উত্তেজনায় ভয়ে এত কাঁপছিল যে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গেল সে। অমনি দানবটা একটা হুঙ্কার দিয়ে ঝাঁপ খেল তার ওপর।

দানবের শরীরের চাপে চিড়েচ্যাপ্টাই হয়ে যেত সে। কিন্তু হঠাৎ বিদ্যুতের বেগে আর-একটা লোক যেন শূন্য দিয়ে ভেসে এল। আর তার দুই লোহার হাতে দানবটাকে তুলে

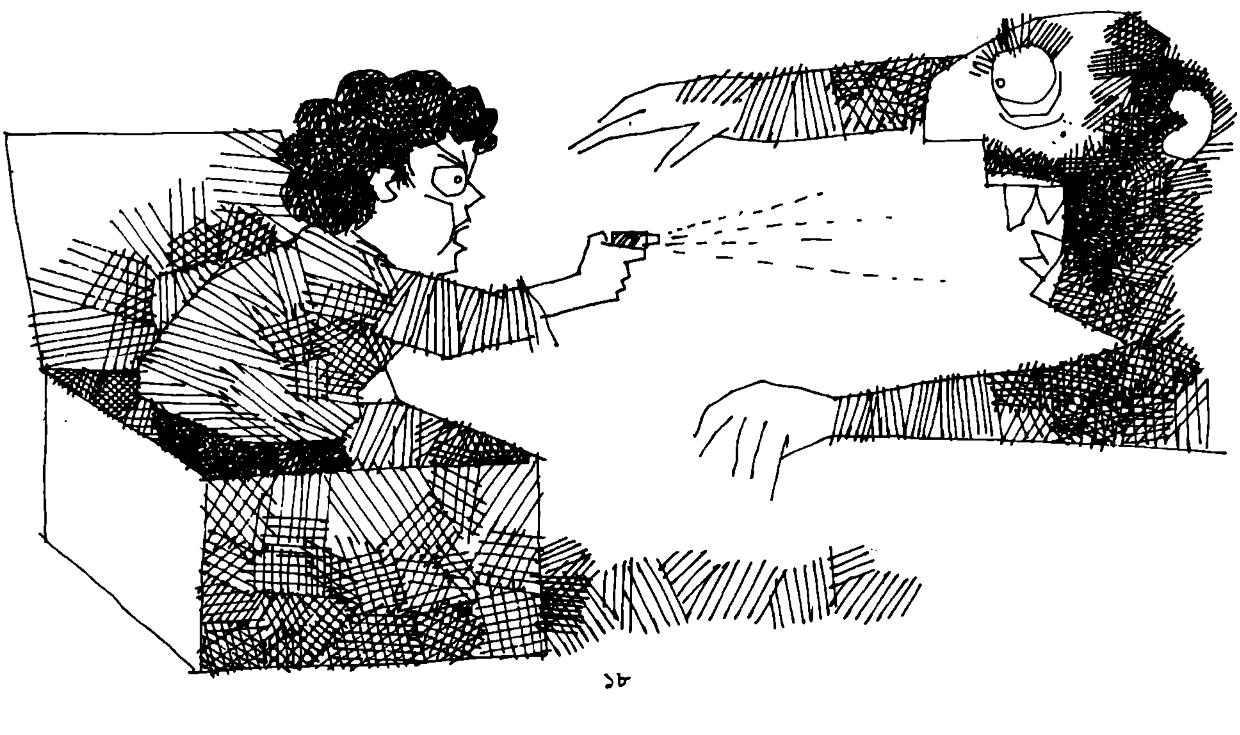

অন্য দিকে ছুঁড়ে দিল।

"রামরাহা !" চেঁচিয়ে উঠল আংটি।

শেষতম দানবটি দৃশ্যটা দেখে চকিতে তার বেল্ট থেকে একটা জিনিস খুলে আনল। সেটা তাক করল রামরাহার দিকে।

এবার আংটির পালা। এক বানরের লাফে সে দানবের হাত ধরে ঝুলে পড়ল। ঝুল খেয়েই দানবের হাঁটুটায় সে পেল্লায় এক কিক জমিয়ে দিল।

মনঃসংযোগে এই সামান্য ব্যাঘাতই চাইছিল রামরাহা। উড়ন্ত এক বল্লমের মতো সে দানবটার বুকে এসে পড়ল। তারপর দানবটাকে অনায়াসে দু'হাতে তুলে আছড়ে ফেলল সে।

রামরাহা সব ক'জন দানবের শরীর তল্লাশ করে বলল, "কিন্তু গোলকটা কোথায় ? সেটা না পেলে তো সব চেষ্টা বৃথা যাবে।"

আংটি আর্তনাদ করে উঠল, "নেই ?"

কোথা থেকে ক্ষীণ একটা গলা বলে উঠল, "আছে ! এখানে !"

রামরাহা দৌড়ে গেল দেয়ালের কাছে। দেয়ালে কম্বিনেশন লকের মতো গোল চাকতি আর নানা সংকেত। রামরাহা কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করে নিয়ে ডিস্কটা ঘোরাতে লাগল। একসময়ে চড়াক করে দেয়ালের গায়ে একটা কুলুঙ্গির ঢাকনা খুলে গেল। তার মধ্যে ঘড়ি। ঘড়ির হাতে গোলক। মুখে হাসি।

রামরাহা গভীর একটা শ্বাস ফেলে পরম নিশ্চিন্তে বলল, "আর ভয় নেই।"

পরিশিষ্ট

বলাই বাহুল্য, মানুষের মস্ত এক বিপদ ঘটতে-ঘটতেও শেষ অবধি ঘটতে পারেনি। অল্পের জন্য ফাঁড়াটা কেটেছে। কিন্তু এ-গল্পের শেষ অবধি কী ঘটল সেটা জানার ইচ্ছে আমাদের হতেই পারে।

রামরাহা খুবই দক্ষতার সঙ্গে সেই গোলকটি ব্যবহার করে দানবদের পুঁতে রাখা চার্জ অকেজো করে দেয়। তার আগেই সে অবশ্য মহাকাশযানটিকে নামিয়ে এনেছিল। নইলে প্রতিশক্তি-উৎপাদক গোলকটির প্রভাবে মহাকাশযানের কলকব্জাও অকেজো হয়ে যেত এবং তারা ঝুলে থাকত মহাশূন্যে। দানবদের অন্য চারটি মহাকাশযান, যেগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে যাত্রা করেছিল সেগুলির ভাগ্যে এরকমই ঘটেছিল।

যে কয়েকজন দানব তাদের হাতে ধরা পড়েছিল তাদের দিয়ে রামরাহা মাটির তলা থেকে সমস্ত চার্জ তুলে আনে। তারপর মহাকাশযানে সেগুলি দানবদের সঙ্গেই তুলে দেওয়া হয়। দানবদের জন্য রামরাহা বা আর কেউ কোনও শাস্তির ব্যবস্থা করেনি। কারণ, তা হলে তাদের খুন করতে হয়। দানবরা অবশ্য রামরাহাকে কথা দিয়ে যায় যে, ভবিষ্যতে তারা আর পৃথিবীতে হানা দেবে না।

বিপন্মুক্ত পৃথিবীতে প্রথম শ্বাস নিয়েই আংটি পাঁচটি ডিগবাজি খেয়েছিল আনন্দে। ঘড়ি খেল ছয়টি। দেখাদেখি পঞ্চানন্দ দশটি ডিগবাজি খেয়ে ফেলল। হরিবাবুর মনে হল, ডিগবাজি খেলে মস্তিষ্কে একটা নাড়াচাড়ার ফলে জাহাজের সঙ্গে মিল খায় এমন একটা শব্দ মাথায় এসেও যেতে পারে, তিনি পনেরোটা ডিগবাজি খেয়ে গায়ের ব্যথায় সপ্তাহখানেক বিছানায় পড়ে রইলেন।

রামরাহা চক-সাহেবের বাড়িতে আরও কয়েকদিন রইল। আংটি আর ঘড়ি কিছুতেই তাকে সমুদ্রগর্ভে ফিরে যেতে দেবে না। রামরাহা তখন কথা দিল যে, সে আরও কিছুকাল পৃথিবীতে থাকবে। এই গ্রহটা তার খুবই ভাল লাগছে। মাঝে-মাঝে সে ঘড়ি আর আংটির কাছে বেড়াতে আসবে। গোলকটা রামরাহার কাছেই রইল। সে ছাড়া এর মর্ম আর কে বুঝবে ?

পঞ্চানন্দ একদিন ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে হরিবাবুকে বলল, "কর্তাবাবু, এবার তো আমাকে ছেড়ে দিতে হয়।"

হরিবাবু আঁতকে উঠে বললেন, "বলো কী হে, তোমাকে ছাড়লে আমার চলবে কেন ?"

"আজ্ঞে, আমি লোক বিশেষ সুবিধের নই। আগেই বলেছিলুম আপনাকে। আমি হলুম গে আসলে গোয়েন্দা।"

হরিবাবু ফের চমকে উঠলেন, "গোয়েন্দা, সর্বনাশ !"

"ঘাবড়াবেন না। গোয়েন্দা শুনলে লোকে ভয় খায় বটে, কিন্তু ভাল লোকদের ভয়ের কিছু নেই। অনেকদিন ধরেই সরকার-বাহাদুর এ-জায়গায় একটা গণ্ডগোলের আঁচ পাচ্ছিলেন। তাই আমাকে পাঠানো হয়েছিল।"

সুতরাং পঞ্চানন্দকেও বিদায় দেওয়া হল।

রয়ে গেল গজ-পালোয়ান। ধীরে-ধীরে তার শরীর শুকিয়ে আবার আগের মতো হয়ে গেল। অবশ্য পঞ্চানন্দ তার সম্পর্কে সব কথাই জানত। একদল খারাপ লোক তাকে লাগিয়েছিল গোলকটা চুরি করতে। গজ-পালোয়ানের অতীত ইতিহাসও খুব ভাল নয়। কিন্তু সে দানবদের সঙ্গে প্রাণ তুচ্ছ করে লড়াই করেছিল বলে শেষ অবধি তার সম্পর্কেও লোকের রাগ রইল না। গজ ফের কুস্তি শেখাতে শুরু করল।

কিন্তু মুশকিল হল, হরিবাবু জাহাজের সঙ্গে মেলানো শব্দটা খুঁজে পাচ্ছেন না। রোজ দিস্তা-দিস্তা কাগজ নষ্ট হচ্ছে।

(সমাপ্ত)

ছবি : দেবাশিস দেব

খুব শিগগিরই শুরু হচ্ছে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

অসাধারণ ধারাবাহিক উপন্যাস

নীলমূর্তি-রহস্য

কাকাবাবু ও সন্তুর দুরন্ত অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী !

একেবারে প্রথম থেকেই পড়া চাই

টিনটিন * হার্জ

জাহাজে আগুন ধরিয়ে ডিঙিতে উঠে সরে পড়েছে ! ...ইঁদুর ! ছুঁচো ! জগঝম্প !
এসো, দেখি কী করা যায় !
যা করবার, চটপট করো !
বাঁচাও ! বাঁচাও !
মরে গেলুম !
খোলের মধ্যে চিৎকার করছে কেউ !
কে তুমি ? কী বলছ ?
আমরা কালো মানুষ ! বাইরে যেতে চাই ! এখানে দম আটকে যাচ্ছে !
নিগ্রো বন্দীর দল ! ওদের তো মরতে দিতে পারি না !
ঠিক বলেছ !
যেমন করেই হোক, আগুনটা আগে নেবাতে হবে !
আঠারো টন বিস্ফোরক রয়েছে ওর মধ্যে ! এক্ষুনি ফাটবে !
দেখি, হোসপাইপ দিয়ে জল বেরোয় কি না !
ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন !
আমি এদিকটা দেখছি ! তুমি গিয়ে আর-একটা হোসপাইপ চালাও !

লোহিত সাগরের হাঙর

কপিরাইট : কাস্টারম্যান এস. এ.

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
মেলচেস্টার রোভার্স
রোভার্সের বিপক্ষে নেমে জিওফ গাইলস আজ বাঘের মতো খেলছে
জিওফ গাইলসকে মেলবরোর কাছে বেচে দিয়ে রয় সকলের বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়েছে। তার উপরে চার্লি কার্টারের বদলে তরুণ উইলিকে গোলে নামানোতেও সবাই খাপ্পা। জিওফ ইতিমধ্যে রোভার্সের বিরুদ্ধে একটি গোল করেছে।
রয় ভাবছে, মা ধরণী, দ্বিধা হও !
দুর্দান্ত গোল দিয়েছে জিওফ ! এই খেলোয়াড়কে বেচে দিল !
উইলিকে সাহস দিতে এগিয়ে এসেছে রয়…
একটুর জন্যে আটকাতে পারলুম না !
তুমি যথাসাধ্য করেছ…
কিন্তু ও-বল কেউই আটকাতে পারত না !
মেলবরোর কোচ ওদিকে আহ্লাদে আটখানা…
রয়, ওই দুধের বাচ্চাকে গোলে নামিয়ে ভাল করোনি !
চালিয়ে যাও অ্যাণ্ডি !
রয়ের দুঃস্বপ্নে অ্যাণ্ডিও ছিল…
দুঃস্বপ্নকে সত্যি হতে দেওয়া চলবে না !
দলকে গুছিয়ে নাও, রয় !
প্যাকো ডিয়াজ জিমিকে বল দিল, জিমি দিল রয়কে…
মার্ভিন ওয়ালেসকে দাও !
রোভার্স সামলে উঠেছে !
এই তো চ্যাম্পিয়নের খেলা !
ভার্ননকে দাও মার্ভি !
দেরি করছে কেন ?
হঠাৎ…
যাঃ !
মার্ভির পা থেকে বল কেড়ে নিয়েছে
দূর দূর, বাজে খেলা !

অর্থাৎ আবার বিপদ ঘনিয়ে উঠল !
সোজা জিওফ গাইলসকে বল পাঠিয়েছে !
সত্যিই তাই···
পায়ে লেগে বেঁকে গিয়ে···
বল গোলে ঢুকল !
রোভার্স ০ মেলবরো ২
ওঃ, গাইলস আজ দুর্দান্ত খেলছে !
আমার দুঃস্বপ্ন যে সত্যি হতে চলল !
জিওফের দাপটে বিরতির আগে খেলা এসেছে মেলবরোর মুঠোয়···
আবার গোল ? ননাঃ, উইলি ঠেকিয়ে দিয়েছে !
ছেলেটা তো মন্দ খেলছে না !
বিরতির সময়ে···
দ্বিতীয় গোলটা আমার পায়ে লেগে হয়েছে, উইলি পজিশনই নিতে পারেনি !
ঠিক কথা নোয়েল, জিওফের কপাল আজ ভাল !
তবে কিনা, আমরাও আজ বাজে খেলছি !
এত বিচ্ছিরি মার্কিং আগে দেখিনি !
জিমি, তুমি মাঠ জুড়ে জিওফকে পাহারা দাও !
ঠিক আছে !
দ্বিতীয়ার্ধের সূচনাতেই কিন্তু···
আঃ !
ট্যাক্‌ল করেছে তবে দেরিতে !
রেফারি ফাউল দিয়েছে !
মেলবরো ডিরেক্ট ফ্রি-কিক পেল ! দেখি কী হয় !
আবার যদি গোল হয়, অবাক হব না !
মেলবরো কি আজ রোভার্সকে গো-হার হারাবে ?
এর পরে আগামী সংখ্যায়

শুকতারা তারা নয়

অনিশা দত্ত

তোমরা নিশ্চয় জানো, আকাশের শুকতারা আদপেই কোনও তারা নয়, আসলে এটি হল পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ—শুক্রগ্রহ।

শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডল সদা মেঘাচ্ছন্ন এবং এই মেঘপুঞ্জের শতকরা পঁচানব্বুই অংশের বেশি হল কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস। বাকিটা নাইট্রোজেন ও সামান্য জলীয় বাষ্প। এখানকার বৃষ্টি ও কুয়াশায় রয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতি। শুক্রপৃষ্ঠ হতে ৫০ কি·মি· উচ্চতার মধ্যে রয়েছে সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘনীভূত বাষ্প।

শুক্রগ্রহের উপরিভাগ রুক্ষ, শুষ্ক ; মরুপ্রায় পাথুরে জমি। পৃথিবীর মতন সবুজ গাছপালার চিহ্নমাত্রও নেই। জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০° সে· আর ওখানের তাপমাত্রা ৪৫২° সে·। কী সাঙ্ঘাতিক গরম আন্দাজ করতে পারছ নিশ্চয়ই। যে-কোনও প্রাণীকেই সঙ্গে-সঙ্গে ঝলসিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে ওই গ্রহের।

সূর্যকিরণ যখন শুক্রগ্রহের আবহমণ্ডলে প্রবেশ করে তখন তা হয় অভিমন্যুর ব্যূহভেদের মতো। প্রবেশপথই জানা আছে, বার হওয়ার পথ অজানা। কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ঘন স্তর থেকে সৌরকিরণ প্রতিফলিত হতে পারে না, সেজন্য গ্রহটিতে প্রাপ্ত সৌরতাপের সমস্ত অংশই কার্বন-ডাই-অক্সাইড স্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকার ফলে সৃষ্টি হয় সাঙ্ঘাতিক উচ্চ তাপমাত্রা। যেহেতু তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে চাপও সমানুপাতে বেড়ে যায়, তাই গ্যাসীয় চাপ খুব বেশি, পৃথিবীর বায়ুচাপের ছিয়াশি গুণ।

১৯৬২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান মেরিনার-২ শুক্রগ্রহের ৩৫,০০০ কি·মি· দূর থেকে ঘুরে এসেছে। ১৯৬৭তে মেরিনার-৫ গিয়েছিল শুক্রের আরও কাছে, শুক্রপৃষ্ঠের ৭,৬০০ কি·মি· পর্যন্ত।

সোভিয়েত রাশিয়ার ভেনাস-১৪, ১৯৮২ সালের মার্চে প্রথম শুক্রগ্রহে অবতরণ করে।

'নাসা'র উদ্যোগে গত ছ' বছর ধরে শুক্রগ্রহ 'পায়োনিয়ার' আকাশযানের পর্যবেক্ষণাধীন রয়েছে। নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার গবেষণালব্ধ ফল অনুসারে মেঘাচ্ছন্ন শুক্রগ্রহের বিস্তারিত মানচিত্র চিত্রণও সম্ভব হয়েছে।

এইমাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে, রাশিয়ার দ্বিতীয় মহাকাশযান 'ভেগা-২' পাঁচ সহস্র লক্ষ মিটার পথ পাড়ি দিয়ে অপর একটি আরোহীবিহীন যন্ত্রযান শুক্রপৃষ্ঠে নামিয়ে দিয়ে এল। ওখানকার কঠিন পাথুরে জমি খননপূর্বক নমুনাও সংগৃহীত হয়েছে।

এই শুক্রগ্রহই চলতি কথায় শুকতারা, তাকেই তোমরা ভোরের আকাশে ঝকঝক করতে দেখ। আবার সাঁঝ-আকাশেও এটি সমান উজ্জ্বল, তাই অনেকে একে সন্ধ্যাতারাও বলে থাকেন।

আজ প্রমিস ব্যবহার ক'রে হাজার হাজার পরিবার চিরকালের ব্যবহৃত **লবঙ্গ তেলের** গুণ তো বুঝছেন!

প্রমিস

আপনিও দেখুন না ব্যবহার ক'রে?

প্রমিস

- দাঁতের ক্ষয় রোধ করে,
- মুখে আনে সুস্বাদ, আর
- দূর করে নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ।

বিশ্বের স্বর্ণপদক বিজয়ী

সুস্থ-সবল দাঁত ও মাড়ি আর নির্মল শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য

বলমারা উৎপাদন

CHAITRA-PLS-664 BEN

বাজনা

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রতিবার শীতের সময়ে, ইস্কুলের ক্লাসে ওঠার পরীক্ষা হয়ে গেলেই মালটিপারপাস-মামার আসার কথা। এবার এলেন গরমের ছুটিতে। এসে শুনলেন পিণ্টু বাড়িতে নেই। ও গেছে দার্জিলিং, মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে ক্লাম্বিংয়ের একটা শর্ট কোর্স করতে। মামার যেমন স্বভাব, শুনেই বললেন, "ছ্যা, ছ্যা, গরমে দার্জিলিং! হিলে যেতে হয় শীতে। এবারের শীতকালটা আমি সিমলায় কাটিয়েছি।"

কেউ বলে দেবার আগেই শিখা বুঝল ইনিই মালটিপারপাস-মামা। শিখা শান্তিনিকেতনে পড়ে। সামার ভেকেশনে বাবা-মা'র কাছে এসেছে। ওকে এই প্রথম দেখলেন মামা। পিণ্টু নেই, এবারটা ওকে নিয়েই থাকতে হবে। মুহূর্তে ভাব জমিয়ে ফেললেন। শিখা সাঁতার জানে, সাইকেল চড়তে পারে; একবার বোলপুর থেকে জয়দেব-কেঁদুলি যাবার বাসে একটা লোক মেয়েদের উত্ত্যক্ত করছিল, শিখা তার জামা খিমচে ধরে হিড়হিড় করে বাস থেকে টেনে নামিয়ে দিয়েছিল, এসব শুনে ভারী খুশি হলেন মামা। বললেন, "বাঃ বাঃ, এই তো চাই, ভাগ্নী কার দেখতে হবে তো। একেই বলে বীরাঙ্গনা।" সম্প্রতি সিমলার পাহাড়ি মেয়েদের দেখে এসেছেন মামা। মাথায় বেল্টের মতন রশি লাগিয়ে, পিঠে দু'মন আড়াই মন বোঝা চড়াই ভেঙে বয়ে নিয়ে যেতে দেখে এসেছেন তিনি। মেয়েদের ওই কাঠিন্য আর কষ্টসহিষ্ণুতা ওঁর পছন্দ। শিখার কোনওরকম মেয়েলিপনা নেই দেখে মামা বললেন, "তোকেই শুধু কিছু দেওয়া হয়নি। আমার ভাগ্নে-ভাগ্নীদের মধ্যে তোরই দেখছি ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার কথা। কী নিবি বল?"

পাশেই হাসি-হাসি মুখে মা দাঁড়িয়ে আছেন। শিখা তাঁর

দিকে চাইল। মা বললেন, "কী আবার নেবে! তুমি আর নাচিও না তো ঘেঁটুদা।"

মামা টের পেলেন কিছু-একটা পুরনো বায়না আছে মেয়ের। হেসে বললেন, "তুই তো জানিস চিমটি, আমি ছেলেমেয়েদের নাচাতেই ভালবাসি," তারপর শিখাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, "লোকে বলে মামারবাড়ির আদর। তোদের এই মামার তো বাড়ি নেই, তা না থাকুক, যে-বাড়িতে মামা সে-বাড়িই মামাবাড়ি। কী নিবি বল?"

শিখা একবার মায়ের দিকে চাইল, একবার মামার দিকে। তারপর একটু ইতস্তত করে বলল, "একটা বড় হারমোনিয়াম।"

মালটিপ্যারপাস-মামার মুখের সব আলো নিভে গেল। মুখ দিয়ে শুধু একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরোল, "বাজনা!" শিখা একটা বড়সড় মুগুর চাইলেও তিনি এতটা বিস্মিত হতেন না।

মা বুঝতে পারলেন সব। তাড়াতাড়ি বললেন, "হবে, হবে, পরে হবে এসব কথা।" শিখাকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন ওখান থেকে।

পিণ্টুর চিঠিতে মালটিপারপাস-মামার অনেক কথা জেনেছে শিখা। মা যা বললেন, সেসব একেবারে নতুন। বোধহয় পিণ্টুও জানে না। গানবাজনার ওপর ভীষণ রাগ মামার। ওঁর ধারণা, গান করে-করেই বাঙালি জাতটা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। ঘরে-ঘরে এত যে গান শেখার হাওয়া এসেছে, উনি বলেন, তাতেই নাকি জাতির পৌরুষ ক্ষয়ে যাচ্ছে। সবকিছু মেয়েলি হয়ে পড়ছে। এই নিয়ে পিণ্টুর বাবার সঙ্গে অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে ওঁর। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে মুকুন্দ দাসের যাত্রা দেখেছিলেন মামা। সেই গানই তাঁর আদর্শ। বলেন, "হার্ট উইক থাকলে ও-গান বসে শুনতে পারবে না। 'সাবধান—সাবধান' বলে যেই একটা হাঁক পাড়বে অমনি পতন ও মূর্ছা। ওকে বলে গান। বীরের জিনিস। একালে ওরকম একটি গাইয়ে দেখাও দিকিনি। দেখাও দিকিনি একজন গাইয়ে, যার শরীরটা পালোয়ানের মতো। সেকালে আমাদের গ্রামে এক কুসুমবালা মালসী গাইত, কী গলা, কী স্বাস্থ্য, গান করবার সময় হাতের মাস্‌ল ফুলে উঠত। এসব জিনিস আর নেই।"

একবার এক আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে গেছেন মামা। সে-বাড়ির পুঁচকে মেয়ে গান শেখে। বাবা-মা মেয়ের গান অতিথিকে শোনাবেই শোনাবে। ভদ্রতার খাতিরে মামা না শুনেও আসতে পারেন না। মেয়ে বসল হারমোনিয়াম নিয়ে, মালটিপারপাস-মামা তার মুখোমুখি। মেয়ের বাবা-মা মামার খানিকটা পেছনে। মেয়ে গান ধরল। মামা বললেন, "বেশ, বেশ, চালিয়ে যাও।" বলছেন বটে, চোখ দুটোকে কিন্তু বিস্ফারিত করেছেন, মুখের রেখা করেছেন কঠিন। যেন গাইয়ে মেয়েটিকে নীরব ভর্ৎসনা করছেন। গানের মাঝখানেই মেয়ে ভয়ে কেঁদে ফেলল। মেয়ের বাবা-মা কিছুই বুঝতে পারেন না। তাঁরা মেয়ের কান্না থামাবার চেষ্টা করেন, সেই সুযোগে চলে আসেন মামা।

এর পর থেকে কেউ কারও বাড়িতে নেমন্তন্ন করলেই মামা জেনে নিতেন সে-বাড়িতে কারও বাজনাবাদ্যির শখ আছে কি না। একবার এক বন্ধুর বাড়িতে বসে কথা বলতে বলতে তক্তপোশের নীচে হারমোনিয়ামের বাক্স দেখে উঠে এসেছিলেন।

শিখার বেলায় কিন্তু মামার এ বিরূপতা আর থাকল না। একদিন শিখাকে নিয়ে বেরোলেন হারমোনিয়াম কিনতে। দোকানে গিয়ে বললেন, "একটা বাজনা দিন তো।" মামা হারমোনিয়ামকে বাজনা বলেন। দোকানদার একটা হারমোনিয়াম টিউনিং করছিল, কাজ করতে করতেই বলল, "কী রকম জিনিস নেবেন?" পাশে শিখা দাঁড়িয়ে ছিল, ওকে দেখিয়ে বলল, "এই মেয়ের জন্যে তো?"

টিউনিং করতে করতে কথা বলছিল দোকানদার। কথার ফাঁকে-ফাঁকে বাজিয়ে বাজিয়ে দেখছিল যন্ত্রটা। তাতেই প্যাঁ-প্যোঁ শব্দ হচ্ছিল। বিরক্ত হলেন মামা। বললেন, "মেয়ের জন্য না কি মামার জন্য!" বলেই গজগজ করতে লাগলেন, "ঘরে-ঘরে আজকাল বাজনা, সকাল-সন্ধে রেওয়াজ হচ্ছে। কোথায় একটু খোলা বাতাসে খেলবে বেড়াবে, তা না—। এই এক ফ্যাশান হয়েছে আজকাল।"

দোকানদার ভদ্রতা করে বলল, "তা যা বলেছেন স্যার।"

মামা আমড়াগাছি পছন্দ করেন না। বললেন, "সে তো আপনাদের জন্যই। খদ্দের ধরার জন্য প্যাঁ—পোঁ করে যাচ্ছেন।"

দোকানদারটি অবাক হল।

মামা বলতে লাগলেন, "আমার বোনের বাড়ির পাড়ায়, গলিতে ঢোকার মুখেই একটা বাড়িতে এতটুকু একটা মেয়েকে গান শেখাচ্ছে। বেলো পর্যন্ত হাত পৌঁছয় না মেয়ের। তবু বাজনা ধরিয়ে দিয়েছে। পুঁয়ে-পাওয়া চেহারা, ছিনে-পড়া হাত, মেয়ের নলি ছিঁড়ে যাবার জোগাড়। এক-একদিন দেখি, রিড টিপছে আর কাঁদছে। এখন মা বসে-বসে বেলো করেন, আর মেয়ে এক হাতে সা রে গা মা। যত্ত সব।"

শিখা লজ্জা পাচ্ছে। বলল, "কীরকম হারমোনিয়াম দেখাবে বললে না মামা?"

মামা বললেন, "আমার ভাগ্নে-ভাগ্নীদের হাতে কোনও জিনিস বেশিদিন টেঁকে না। বেশ শক্তপোক্ত বাজনা দেবেন। শালকাঠের বাজনা হবে?"

দোকানদারের বিষম খাওয়ার জোগাড়। তবু স্বাভাবিক গলায় বলল, "আজ্ঞে, হারমোনিয়াম হল নরম কাঠের জিনিস। শালকাঠের তো হয় না।"

মামা বললেন, "হবে না কেন? হওয়ালেই হয়। আসলে আপনারা চান বছর-বছর ভাঙুক।"

দোকানদার বলল, "এরই মধ্যে দেখেশুনে নিয়ে যান। পনেরো-বিশ বছর হেসেখেলে চলে যাবে।"

কিছুতেই বাজনা পছন্দ হয় না মামার। শিখা শান্তিনিকেতনে নিয়মিত গান শিখেছে, একবার বলতে গেল, "তুমি সরো মামা, আমি দেখছি।"

মামা আমলই দিলেন না। বললেন, "তুই ছেলেমানুষ, কেনাকাটার তুই কী বুঝবি?" বলেই একটা হারমোনিয়াম অবলীলাক্রমে দু'হাতে তুলে ওপর দিকে শূন্যে ছুঁড়ে দিলেন। তারপরই লুফে নিয়ে বললেন, "এ তো পনেরো কেজিও হবে না। এর দাম ছ'শো টাকা। বাজনার কেজি কত করে হে?"

শিখা মামাকে থামাল। শেষ পর্যন্ত কেনা হল

হারমোনিয়াম। দাম মিটিয়ে দিয়ে হারমোনিয়াম খুলে দেখে ভীষণ হতাশ হলেন। বললেন, "ভেতরটা যে একেবারেই ফাঁপা, মাল কিচ্ছু নেই।"

শান্তিনিকেতনের মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে শিখার। ছুটি থেকে ফিরে গিয়ে এর পরের বার যখন আসবে সেই ওর শেষ আসা। তখন বাড়িতেই থাকবে। বাড়িতেই গান শিখবে। কার কাছে গান শেখা যায়, এ অঞ্চলে ভাল গানের মাস্টার কে, এই নিয়ে শিখার বাবা-মা'র মধ্যে কথা হচ্ছিল। মামা বললেন, "মাস্টার আবার কী হবে ?"

শিখার মা বললেন, "মাস্টার ছাড়া আবার গান হয় নাকি ?"

মামা বললেন, "চেষ্টা থাকলেই হয়। আমাদের ছেলেবেলায় ক'জন মাস্টার ছিল ?"

শিখার মা বললেন, "তুমি তো আর গান শেখোনি, ঘেঁটুদা।"

শিখার বাবা, উকিলবাবু, রসিক মানুষ। একটু হেসে বললেন, "নিয়োগীদার গান শিখতে হলে মাস্টার আনতে হত গোবরবাবুর আখড়া থেকে।"

মামা বললেন, "তা ঠিক। কিন্তু তোমরা যাই বল, বাড়িতে গানের মাস্টার ঢুকিয়ো না। গানের মাস্টার বলবে ডুগি-তবলা চাই, তখন তবলচি ধরতে ছোটো। তবলচি বলবে খঞ্জুনি হলে বেশ হয়। হয়তো রাস্তা থেকে বৈরাগী-বোষ্টম ধরে নিয়ে আসবে। এই করতে করতে বাড়িময় শুধু বাজনাবাদ্যি। ভাগ্নীর আমার মাথা ধরবে, ও গিয়ে শুয়ে পড়বে। ওরা তখন চায়ের পর চা খাবে, আর সবাই মিলে কেত্তন প্র্যাকটিস করবে।"

শিখা বলল, "তোমার যত বাজে কথা মামা।"

বাবা বললেন, "যদ্দিন না পাকাপাকি এখানে আসছিস, ওটা থাক না। বাক্সসুদ্ধু খাটের নীচে ঠেলে দে।"

"আর বাজনার খোলে আরশোলার বাসা হোক," মামা বললেন, "জিনিসটা সড়গড় করার জন্যে মাসখানেকের মতো একজন মাস্টার ধরলেই হয়। তোমরা ভেবো না, আমি দেখছি।" পরের দিন গলির মুখের বাড়ি থেকে মাস্টারমশাইকে ধরে নিয়ে এলেন।

মাস্টারমশাই এসে জিজ্ঞেস করলেন, "কার জন্যে ? কোন্ ইয়ার ?"

মামা ডাকলেন, "শিখা, এদিকে আয়। বের কর।"

হারমোনিয়ামটা মাস্টারমশাইয়ের সামনে ধরে দিয়ে মামা বললেন, "দেখুন দিকিনি, জিনিসটা কেমন ? চল্লিশ টাকা কেজি।"

মাস্টারমশাই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এ কী রসিকতা ? আপনারা কি যাত্রার দলের মোশানমাস্টার খুঁজছেন ? আমি স্কুলমাস্টার, ও-বাড়ির মেয়েটিকে পড়াই।"

মালটিপারপাস-মামা কাকে ধরতে কাকে ধরে নিয়ে এসেছেন। একটু বিব্রত বোধ করলেন। তারপর পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য বললেন, "গানবাজনা একটুও আসে না ?"

এবার ফিক করে হেসে ফেললেন মাস্টারমশাই। লজ্জা-লজ্জা ভাব করে বললেন, "বি· টি··তে মিউজিক ছিল। সেইজন্যেই ছাত্রীটিকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছিলুম।"

মামা বললেন, "তবে তো ভুল করিনি।"

মাস্টারমশাই সবক'টা অক্‌টেপ দ্রুত বাজিয়ে বললেন, "কাঠিগুলো বড্ড ঢিলে, খট্‌খট্ আওয়াজ হচ্ছে।" তারপর শিখাকে বললেন, "একটু ভিজে-ভিজে জায়গায় রেখো, কাঠিগুলো ফুলে ঠিক হয়ে যাবে।"

মামা বললেন, "অমাবস্যা-পূর্ণিমায় ফোলে নাকি, বাতব্যাধির মতো ?"

মাস্টারমশাই চলে গেলেন। মামা বললেন, "দাঁড়া, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। শুকিয়ে কাঠি চিমড়ে মেরে গেছে তো ? এক শিট ব্লটিংপেপার নিয়ে আয়। জলে চুবিয়ে তাই দিয়ে ঢেকে দিই কাঠিগুলো।"

মামার চিকিৎসায় রিডের কাঠি ফুলেফেঁপে একেবারে ঢোল। নট্ নড়নচড়ন। চাপ দিলে ঢেঁকির মতো ওঠে, আর নামে না।

মামা বললেন, "বিপরীত চিকিৎসা করতে হবে। রোদ্দুরে দে।"

তাতে কিছুক্ষণ ঠিক বাজে আবার রাত্তিরে যে-কে-সেই। সব রিড বসে যাচ্ছে।

মামা বললেন, "লোকটা ঠকিয়েছে। এ বাজনার ঠাণ্ডার ধাত আছে। রোদ্দুরে দিলেই বাজে, আর ঘরে আনলেই বাজানো যায় না !"

শিখা বলল, "কী হবে তা হলে ?"

সব সমস্যার ঝটিতি সমাধান আছে বলেই উকিলবাবু মামাকে বলতেন মালটিপারপাস-মামা। এবারেও সহজ সমাধান দিলেন তিনি। বললেন, "কিচ্ছু হবে না। মাস্টার ঠিক হলে, বলবি, কয়েকদিন রোদে বসে শেখাবে।"

শিখার মা বললেন, "সে আবার হয় নাকি ! তুমি দোকানে নিয়ে গিয়ে সারিয়ে আনো ঘেঁটুদা।"

মামা রেগে বললেন, "ওইজন্যেই শালকাঠের জিনিস চেয়েছিলাম, নিয়ে গিয়ে দোকানদারের মাথায় ঠুকতাম।" বলেই হারমোনিয়ামটা তুললেন, গজগজ করতে লাগলেন, "দিশি কাঠের জিনিস, ঠাণ্ডা মেরে গেছে।"

শিখা বলল, "এখন আর রোদ কোথায় পাবে ?"

মামা সে-কথার উত্তর না দিয়ে সোজা রান্নাঘরে গিয়ে সেটাকে উনুনের ওপর বসিয়ে দিলেন। উত্তাপ পেয়ে অনেকগুলো রিড উঠে গিয়ে, ভেতরের হাওয়া বেরিয়ে একটা বিকট শব্দ হল। মা বললেন, "যাঃ, গেল !"

হারমোনিয়ামের শোকে চোখে জল এসে গিয়েছিল শিখার, কিন্তু ফাটা হাঁ-করা বেলো, অসংলগ্ন রিড আর তোবড়ানো খোলটা দেখে ও ফিক্ করে হেসে ফেলল।

ছবি : প্রবীর সেন

জেনে নাও

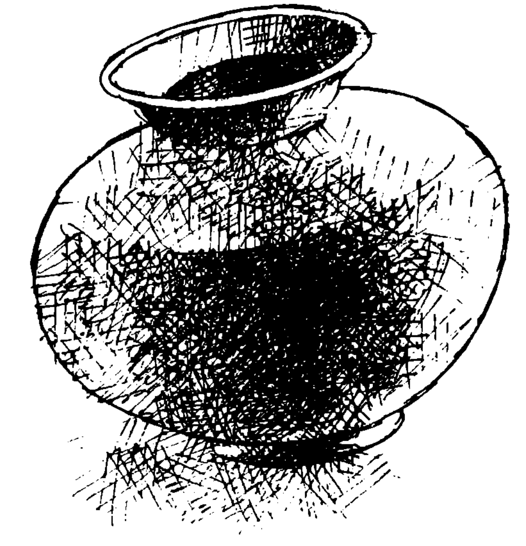

মাটির কলসির জল ঠাণ্ডা কেন

গরমের দিনগুলিতে মাটির কলসিতে জল রাখলে জল রীতিমত ঠাণ্ডা হয়। বিশেষ করে রাস্তায় হেঁকে যাওয়া নতুন মাটির কলসি বা কুঁজো কিনে তাতে যদি মা জল ভরেন, তাতে জল ঠাণ্ডা হবে আরও বেশি। গরমের দিনে সে জলে তৃষ্ণা মিটবে।

কিন্তু মাটির কলসিতে জল ঠাণ্ডা হয় কেন ?

মাটির কলসি বা কুঁজো তৈরি করার সময় তাতে বালি মেশানো হয়। ফলে তার গায়ে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। জলকে ঠাণ্ডা করায় ওই ছিদ্রগুলির কাজ সবচেয়ে বেশি। মাটির আধারের ওই সব ছিদ্র দিয়ে জল চুঁইয়ে বাইরে আসে আর উবে যায়। কিন্তু বাষ্প হতে গেলে উষ্ণতার দরকার। ওই উষ্ণতা সে নেয় জল থেকে। ফলে জল ঠাণ্ডা। গরমের দিনগুলিতে এই উবে যাওয়ার ব্যাপারটা সমানে চলতে থাকে। তখন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম। সেইজন্যে জলীয় বাষ্পের টান আছে। ছিদ্রপথে তাই জল বেরিয়ে আসছে আর উবে যাচ্ছে। এই উবে যাওয়ার জন্যে জল ঠাণ্ডা। পুরনো কলসিতে জল কিন্তু নতুন কলসির মতো ঠাণ্ডা হয় না। এর কারণ কী ?

কারণ মাটির পাত্র পুরনো হলে ছিদ্রের মুখ ধুলো পড়ে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নতুন পাত্রে যতটা জল উবে যায় বা যতটা উষ্ণতা টানে পুরনো পাত্রে ততটা নয়। সেই কারণে পাত্র পুরনো হলে ঠাণ্ডা হয় কম।

বর্ষাকালেও কিন্তু মাটির পাত্রের জল বেশি ঠাণ্ডা হয় না। সে সময়ে বাতাস বেশি আর্দ্র অর্থাৎ বাতাসেই জল, ফলে বাতাস জল টানে কম।

অরূপরতন ভট্টাচার্য

ডাক্তারবাবু বলছেন

গ্রীষ্মকালের অসুখবিসুখ

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, তাই গরম অত্যন্ত বেশি হয়। আবহাওয়া যত গরম হতে থাকে, তার সঙ্গে আর্দ্রতাও বাড়তে থাকে। এই সময় খুব অসুখবিসুখ হয়। গরমে ভিজে আবহাওয়ায় সমস্ত রোগের জীবাণুই খুব সক্রিয় ও সবল হয়ে ওঠে। ফলে যেকোনও ধরনের রোগ এই সময় হতে পারে।

বেশি রোদে ঘুরলে হিটস্ট্রোক বা সর্দিগর্মি হতে পারে। গরমকালে ঘামের জন্যে শরীরের জলীয় অংশ খুব বেশি বেরিয়ে যায়। ফলে শরীরের ভেতরটা শুকনো হয়ে যায়। এদিকে রোদ্দুরের তাত লাগলে শরীর গরম হয়ে যায়। মস্তিষ্কের নীচের দিকে আমাদের শরীরের হিট সেন্টার আছে, মানে সেখান থেকেই শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং আমাদের শরীরের স্বাভাবিক উত্তাপ বজায় রাখে। অতিরিক্ত রোদের তাপে হিট সেন্টার গরম হয়ে যায়, ফলে জ্বর বেড়ে যায়।

যাতে হিট সেন্টার বেশি তেতে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। প্রথম হচ্ছে বেশি রোদ্দুরে ঘুরতে পাবে না। রোদে বেরোবার দরকার হলে ছাতা মাথায় বেরোবে। গরমকালে গরমের দেশে ছাতা মাথায় দেওয়া কোনও লজ্জার ব্যাপার নয়। বর্ষাকালে ছাতা ব্যবহারের চেয়ে গ্রীষ্মকালে ছাতা ব্যবহার করা অনেক বেশি দরকারি।

গরমকালে বেশি জল খাবে। শরীরের যে জল ঘাম হয়ে বেরিয়ে যায়, তার পূরণ দরকার, সেই জন্যে বেশি করে জল খাবে। গরমকালে একটু ছোটাছুটি বা খেলাধুলো করলেই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তার প্রধান কারণ, ঘামের সঙ্গে শরীরের ভেতরের নুন বেরিয়ে যায়। সেই জন্যে শুধু জল না খেয়ে, জলের সঙ্গে একটু নুন আর খানিকটা চিনি মিশিয়ে খেলে দেখবে শরীর বেশ তরতাজা হয়ে উঠেছে। চিনি থেকে শরীরের মধ্যে গ্লুকোজ তৈরি হয়, আর গ্লুকোজ থেকে শরীরের কোষ এনার্জি পায় এ কথা সকলেই জানো।

বরফ-জল বা বরফ-গলা জল খাবে না। বাইরের গরমের জন্য শরীরের কোষগুলো, বিশেষ করে গলার কোষগুলো গরম হয়ে থাকে। যেই বরফ-ঠাণ্ডা জল গলার মধ্যে যায়, তক্ষুনি গলার কোষগুলি ঠাণ্ডা সংকুচিত হয়ে পড়ে। এই অকস্মাৎ সংকোচনের ফলে কোষে ইরিটেশন হয় এবং কোষগুলি রুগ্ণ হয়ে পড়ে। যাকে ডাক্তারি ভাষায় বলা হয় ফ্যারেনজাইটিস। মাটির কুঁজোর জল সবচেয়ে ভাল, আর আগেই বলেছি পানীয় জল দশ-পনেরো মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে।

যদি কারও হিটস্ট্রোক বা সর্দিগর্মি হয়ে যায়, তাকে কোনও ওষুধ দেবে না। মাথায় আইস-ব্যাগ অথবা একটা বড় বরফের টুকরো কাপড়ে জড়িয়ে ধরবে, আর সারা গা ঠাণ্ডা জলে স্পঞ্জ করে মুছিয়ে দেবে। এতেই দেখবে হিট সেন্টার আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, আর শরীরের উত্তাপও কমে গেছে।

(ডাঃ) বিশ্বনাথ রায়

(সুদানের উপকথা)

হুদো

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা ছেলে তার নাম মুমুদ, বাপের সঙ্গে রোজ রোজ ভোর হলে যায় জ্বালানি কাটতে, বাজারে এনে বেচে তবে পয়সাকাহন, তবে না খাওয়াদাওয়া দু'বেলাকার। একদিন গেছে—লম্বা পা ফেলে বাপ কেবলই এগিয়ে যাচ্ছে বনপথে, মুমুদ খালি পিছিয়ে পড়ছে আর ডাকছে, "বাবা তুমি কোথায়—"

"এই তো আমি।"

গলা ঠাওর করে মুমুদ এগোচ্ছে, যেতে যেতে ক্রমেই গভীর হয়ে উঠছে জঙ্গল। "বাবা তুমি কোথায়—"

সাড়া আসছে যেন অনেকটা দূর থেকে। "এই তো আমি।"

কই! কোথায়? দেখতে দেখতে রাস্তা গুলিয়ে ফেলল মুমুদ।

এদিকে হয়েছে কী, মুমুদের বাবা সেই মুহূর্তে কুড়ুল গাছে ঠেস দিয়ে নদী দেখে গেছে গলা ভিজোতে। মুমুদ দূর থেকে ডাকছে, "ও বাবা, তুমি কোথায়?"

কুড়ুলটাই জবাব দিচ্ছে বাবার হয়ে, "এই তো আমি।"

মুমুদ তো তা জানে না। সে গলা ঠাওর করে এগোতে থাকে।

কিন্তু কিছুতেই আর পায় না।

এবাগে ওবাগে দোনোমোনো করতে গিয়ে আরও সব গুলিয়ে যাচ্ছে মুমুদের। রোদ পড়ে আসছে দেখে চোখে ধাঁধা দিয়ে উঠল। তখুনি সে দেখতে পেলে এক নদী।

নদীর পাড় অবধি নেমে জল খাবে কী, অত বড় ছেলে গিয়ে কাঁদতে বসল। তারপর কেঁদে-কেঁদে একটু শান্তি হতে পাড়ের মাটি ছেনে গড়তে বসল দুটো ছোট ছোট ভগবতী গোরু, আর একটা হুম্বো চাষ-দেওয়া যাঁড়। তারপর মনে-মনে বলছে, "ঠাকুর, তুমি যদি সত্যিকার ঠাকুর হও তো জিইয়ে দাও আমার পুতুল ক'টাকে—"

বলতে বলতে হাম্বারব করে গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল চিকচিকে নধর দুটো গোরু আর পেল্লায় বলদ একজনা।

মুমুদ খুশি মনে নদীপাড়ে একটা ডালপালার চালাবাড়ি বানিয়ে সামনের জমিটুকুতে চাষ দিলে। আর সময়

যেতে এত ফসল ফলল যে, যত খায় তার দুনো বিলোয়,তার দশগুণ বেচে নিয়ে হাটে। দু-পাঁচ বচ্ছরেই মুমুদের ঘরে টাকা ধরে না। বড় চাষি বলে নাম চাউরে যায় তার দশখানা গাঁয়ে।

এদিকে বড় মানুষ হলে কী হয়, ঘরছাড়া হয়ে আছে একা-একা। সে কদ্দিন হয়ে গেল, মুমুদের মনে সুখ নেই। কোথায় রয়ে গেছে যে তাদের বাড়ি, কোথায় তার বাবা, কে জানে! মুমুদের ঘরে তার সঙ্গী পুষেছে একটা মিনি বেড়াল, এক ঝুঁটো কুঁকড়ো, আর হুদো পায়রা। পায়রাটাকে আদর করে ডাকে সে হুদো বলে। একদিন বেড়ালটাকে ডাক দিয়ে মুমুদ বলছে, "হ্যাঁ রে মিনি, তুই তো কত্ত ঘুরিসফিরিস, আমার বাবাকে যদি দেখিস কী বলবি ?"

"ও মা, কী আবার বলব! বলব, মিয়াও মিয়াও, মাছ লে আও, দুধ পিলাও মিউ মিউ—"

"এই ?"

মুমুদ কুঁকড়োকে ধরল গিয়ে। "হ্যাঁ রে ঝুঁটো, তুই তো সাতসকালে গাছের চুড়োয় উঠে ডাক পেড়ে পাড়া জাগাতে থাকিস, আমার বাবাকে যদি দেখিস কী বলবি ?"

"ও মা, কী আবার বলব! বলব, চিচিক চিক, দানা যে পায় সে আমায় দিক, কোঁকর কোঁ সামনে থো, তারপর ক্কুক ক্কুক ক্কুক।" কুঁকড়ো হেসে উঠল।

"এই ?"

মুমুদ ধরল পায়রাকে। "হ্যাঁ রে হুদো, কত্ত দূর ওড়াউড়ি করিস, আমার বাবাকে যদি দেখিস কী বলবি ?"

"ও মা! কী আবার বলব, বক বকুম কুম, ওগো মুমুদের বাপ, কেমন ধারা লোক বাপু তুমি! তোমার ছেলেটা যে হেদিয়ে মরছে তোমায় দেখতে, ফিরে চাও তো এসো আমার সঙ্গে—"

"বলবি ?"

"হ্যাঁ গো।"

সত্যিই উড়তে উড়তে একদিন সে দেখতে পেলে মুমুদের বাপকে। উঠোনে কুঁজো হয়ে বসে-বসে বিড়বিড় করছে—"মুমুদ, ওরে মুমুদ, ওরে মুমুদ ..."

হুদো গিয়ে বসল সামনেটাতে। "ওগো মুমুদের বাপ, ছেলেকে ফিরে পেতে চাও তো এসো আমার সঙ্গে—"

"তুই জানিস আমার মুমুদকে ?"

"জানি গো, জানি।" মুমুদের মা'ও সেই দণ্ডে বেরিয়েছে ঘর থেকে। আর দু'জনাতে পাগলের মতো ছুটতে লেগেছে তখুনি পায়রার পিছন-পিছন—লতায় কাঁটায় চাড়ায় ঢেলায় গা পা বিঁধিয়ে সে দ্যাখে ছবির মতন মুমুদের পাতাছাওয়া চালাবাড়ি, সামনে তকতকে উঠোন, একপাশে পাহাড় মরাই।

"এই নাকি মুমুদের বাড়ি ?"

মা বাপ আর ছেলে তারপর রয়ে গেল একত্তরে। কতদিন—

তাদের পাহারা দিয়ে বেড়ায় একটা মিনি বেড়াল, একটা ঝুঁটো কুঁকড়ো, আর সেই হুদো—সাত বনে ওড়া বকবকুম পায়রা।

ছবি : দেবাশিস দেব

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়

মেদিনীপুর জেলায় যে-ক'টি নামকরা পুরনো স্কুল আছে, ঘাটাল শহরের ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয় তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৮ সালে ঘাটাল অঞ্চলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিদ্যালয়টির সূচনা করেন। বিদ্যালয়-ভবন তৈরির জন্য পনেরো শো টাকা অতিকষ্টে সংগ্রহ হওয়ার পর এঁরা বাকি পাঁচশো টাকা সাহায্য চেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখেছিলেন। বিদ্যাসাগর এঁদের বিমুখ করেননি। তিনি এই মহৎ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে উদ্যোক্তাদের লিখেছিলেন, "আপনাদিগের উদ্যোগে ঘাটালে বিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। উহার গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে যে ৫০০

টাকা অনটন আছে আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব সে বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিবেন, তজ্জন্য অন্য চেষ্টা দেখিবার আর প্রয়োজন নাই।" বিদ্যাসাগর-অনুজ শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নের 'বিদ্যাসাগর জীবন-চরিত'-এ এই দানের উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, "এরূপ দান দেখিয়া ও শুনিয়া ঘাটাল চৌকির সম্ভ্রান্ত লোকেরা আহ্লাদিত হইয়া বলিয়াছিলেন যে আমরা জমিদার তথাপি ১০ বা ১২ টাকার উর্ধ্ব সাহায্য করিতে সাহস করি নাই কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় অকাতরে ৫০০ টাকা প্রদান করিলেন।" ১৮৮২ সালে এই স্কুল মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয় থেকে উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ে উন্নীত হয়। দু'জন ছাত্র, শ্রীপদ চক্রবর্তী ও তারাপ্রসন্ন মিত্র, এন্ট্রান্স পরীক্ষাও দেন এই বছর। প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এই স্কুলের প্রথম প্রধানশিক্ষক। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর মৃত্যুর

"আমরা জমিদার
তথাপি ১০ বা ১২ টাকার উর্ধ্ব
সাহায্য করিতে সাহস করি নাই
কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়
অকাতরে
৫০০ টাকা প্রদান করিলেন"

আগে এই স্কুলে এসে ছাত্রদের মিষ্টি খাইয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের স্মৃতিবিজড়িত এই স্কুলের বহু ছাত্র পরবর্তী জীবনে যশস্বী হয়েছেন। উল্লেখযোগ্য নাম: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ গুণময় মান্না, ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী, ডঃ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ ধ্রুবানন্দ দে, মহিমারঞ্জন অধিকারী, স্বামী তথাগতানন্দ, স্বামী শান্তরূপানন্দ, ডাঃ সনৎ মণ্ডল। বর্তমান ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০০। স্কুলের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। ১৯৮৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল ৭৮ জন। প্রথম বিভাগ—৭, দ্বিতীয় বিভাগ—২৬, তৃতীয় বিভাগ—২৮। ১৯৮৪ সালে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১০৮। প্রথম—৯, দ্বিতীয়—২৫, তৃতীয়—৫২। ১৯৮৫ সালে পরীক্ষা দিয়েছিল ৮৯। পাশ করেছে ৭৬। প্রথম বিভাগ—১১, দ্বিতীয় বিভাগ—৩১, তৃতীয় বিভাগ—৩৪।

স্কুলের বর্তমান প্রধানশিক্ষক গোবর্ধনধারী পাঁজা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজির এম· এ·। ১৯৭১ সালে প্রধানশিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। এর আগে তিনি দুর্গাপুর ও বাঁকুড়ার দুটি স্কুলে যথাক্রমে সহকারী শিক্ষক ও প্রধানশিক্ষক ছিলেন। কীভাবে তৈরি হলে পরীক্ষার ফল ভাল হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাঁজা জানালেন, "পড়াশোনাটাই হল আসল কথা। ভালভাবে পড়াশোনা করলে পরীক্ষার ফল ভাল হতে বাধ্য। আমাদের ছাত্রজীবনে দেখেছি, পড়ুয়ারা মন দিয়ে লেখাপড়া করত। তাদের মধ্যে নিষ্ঠা ছিল। একাগ্রতা ছিল। বড় হওয়ার স্বপ্ন ছিল। দুঃখের বিষয়, এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে সেই নিষ্ঠা দেখতে পাই না। শেখবার

"পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া,
যেটুকু পড়লাম তা লিখে ফেলা,
তারপর সেই লেখা মাস্টারমশাইদের
দেখিয়ে ভুল শুধরে নেওয়া,
ভাল ফল করতে হলে এ-সব
নিয়মিত করা চাই"

আগ্রহ বড় কম। পরিশ্রম করতে চায় না। দেখে সত্যি খুব কষ্ট হয়। পরীক্ষায় ভাল ফলের জন্য এগুলোও কিন্তু খুব দরকার। ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতাও এখন বেশ বেড়েছে। এটা ভাল নয়। পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়া, সেইসঙ্গে যেটুকু পড়লাম বাড়িতে নিজের মতো করে তা লিখে ফেলা, তারপর সেই লেখা মাস্টারমশাইদের দেখিয়ে ভুল শুধরে নেওয়া, ভাল ফল করতে হলে এ-সব নিয়মিত করা চাই।"

ইংরেজি প্রসঙ্গে প্রধানশিক্ষকের বক্তব্য, "গ্রামবাংলার ছেলেমেয়েরা অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় ইংরেজিতে দুর্বল। এই বিষয়টিকে তারা ভয়ও পায়। কিন্তু ইংরেজি কি সত্যিই ভয়ের বিষয়? মোটেই না। **একটু মনোযোগ আর যত্ন নিয়ে যদি ইংরেজি পড়া যায়, তা হলে ভাল ফল করা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। পাঠ্যবই ভালভাবে পড়া থাকলে নোটবইয়ের দরকার হয় না।** এখনকার অধিকাংশ নোটবই অত্যন্ত বিষাক্ত। সুতরাং সাবধান!"

বাংলা সম্বন্ধে প্রধানশিক্ষক শ্রীপাঁজা জানালেন, "বাংলা মাতৃভাষা বলে বেশির ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই এই বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। তার ফলে হয় কী? বিস্তর ছেলেমেয়ে বাংলায় ফেল করে।" বাংলার শিক্ষক বিশ্বনাথ কাণ্ডার আমাদের আলোচনায় যোগ দিয়ে বললেন, "পাঠ্যবই তো পড়তে হবেই, সেইসঙ্গে ব্যাকরণও পড়তে হবে দরদ দিয়ে। ব্যাকরণকে অবহেলা করে কারও ভাষার ভিত পোক্ত হতে পারে না। আর অধিকাংশ ছেলেমেয়ের হাতের লেখা খুব খারাপ। ইড়িং বিড়িং হাতের লেখা দেখলে পরীক্ষকের মেজাজ বিগড়ে যেতে বাধ্য।"

অঙ্ক সম্পর্কে প্রধানশিক্ষক বিশেষ কিছু বললেন না। সহকারী প্রধানশিক্ষক গৌরমোহন দৈ জানালেন, **"অঙ্কের প্রথম এবং শেষ কথা অনুশীলন। অনুশীলনের অভাবে ভাল ছাত্রও মার খায়, জানা অঙ্কের ভুল উত্তর লিখে আসে।** বাড়িতে রোজ অন্তত দশটা অঙ্ক কষা উচিত।"

ইতিহাস সম্পর্কে এই বিষয়ের শিক্ষক সুবলচন্দ্র রানা ও ভাগবতচন্দ্র ঘোষ বললেন, "মাধ্যমিকে ইতিহাসের পাঠ্যসূচী একটু বেশি। বিষয়টির প্রতি পড়ুয়াদের ভালবাসাও বড় কম। অনেকেই ইতিহাসকে তত গুরুত্ব দেয় না, আবোল তাবোল উত্তর লেখে। এর ফলও হয় মারাত্মক। বিস্তর ছেলে ফেল করে। মন দিয়ে ইতিহাস পড়তে পারলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। সুন্দর নম্বর ওঠে।"

ভূগোল সম্পর্কে বিষয়-শিক্ষক অরবিন্দ পাইন জানালেন, "ভূগোলে আঁকাজোকার ভূমিকা নেহাত কম নয়। ধরা যাক, পৃথিবীর আবর্তন-গতি বিশদভাবে বুঝিয়ে লিখতে বলা হয়েছে। উত্তরের সঙ্গে যদি ছবি এঁকে দেখানো যায়, তা হলে বিষয়টি যে শুধু পরিষ্কার হবে, তাই নয়, নম্বরও উঠবে চমৎকার। ম্যাপ আঁকার অভ্যাসও খুব দরকার। ম্যাপ দেখে ভূগোল পড়তে পারলে সুফল পাওয়া যায়।"

বিজ্ঞান সম্পর্কে এই বিষয়ের শিক্ষক সুশীল কুণ্ডু দাস ও জগন্নাথ গোস্বামী অনেক প্রয়োজনীয় কথা বললেন। তাঁদের মতে, **"বিজ্ঞান মুখস্থের বিষয় নয়, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার বিষয়। বিজ্ঞানে ছবির ভূমিকা অপরিহার্য।** কাজেই ছবি আঁকাটা ভালভাবে রপ্ত করতে হবে।"

কর্মশিক্ষা বিষয়টি সম্পর্কে প্রধানশিক্ষক শ্রীপাঁজার বক্তব্য এইরকম: "বিষয়টি ভাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কতটা কাজে লাগে সেটাই হল প্রশ্ন।"

কথায়-কথায় প্রধানশিক্ষক জানালেন, 'আনন্দমেলা' কাগজটি তাঁর খুব প্রিয় কাগজ। ছোটদের কাগজ বটে, কিন্তু এই কাগজটির সঙ্গেই তাঁর বন্ধুত্ব সবচেয়ে বেশি।

শ্যামলকান্তি দাশ

ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

অমিতাভ পাইন ঘাটাল বিদ্যাসাগর উচ্চ বিদ্যালয়ে ফাইভ থেকে পড়ছে। ফার্স্ট হচ্ছে। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষায় ৯০০ নম্বরের মধ্যে ৬৬৩ পেয়ে নাইন থেকে টেন-এ উঠেছে ফার্স্ট হয়ে। অমিতাভর বাবা শ্রীঅরবিন্দ পাইন, মা শ্রীমতী গীতা পাইন।

অমিতাভ সারাদিনে সাত-আট ঘণ্টা পড়ে, ছুটির দিনে আর একটু বেশি। অমিতাভর বাবা ইংরেজি বাংলা দেখিয়ে দেন। একজন গৃহশিক্ষক আছেন, তিনি দেখিয়ে দেন অঙ্ক ও জড়বিজ্ঞান।

অমিতাভ গল্পের বই পড়তে ভাল বাসে। সত্যজিৎ রায়ের লেখা ও খুব পছন্দ করে। বিদেশী লেখকদের বইও অনেক পড়েছে।

খেলাধুলোও করে অমিতাভ। ক্রিকেট আর ফুটবল খুব প্রিয় খেলা।

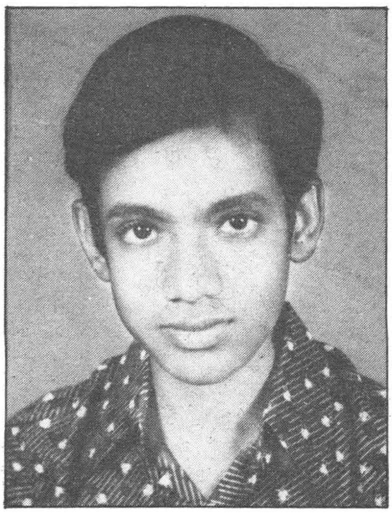

প্রিয় ক্রিকেটার: সুনীল গাওস্কর। প্রিয় ফুটবলার: লেভ ইয়াসিন আর অতনু ভট্টাচার্য।

স্কুলে যে-সব বই পড়ানো হয়, সেগুলো ছাড়া আরও কিছু বই পড়ে অমিতাভ। **ইংরেজি**: পি· কে· দে সরকার ও নেসফিল্ডের বই। **বাংলা**: পি· আচার্য ও মনোজিৎ বসু। **ভূগোল**: বসু-ভট্টাচার্য-বসু, উপেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী। **অঙ্ক**: কেশব নাগ, পি· এম· কারক, মনোমোহন রায়চৌধুরী। **ভৌতবিজ্ঞান**: চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত ও সমর গুহ, রঞ্জিত দাস ও বিদ্যুৎকান্তি গুপ্ত। **জীবনবিজ্ঞান**: নন্দ-দাস-গিরি, অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী। অমিতাভর অতিরিক্ত বিষয়: **ঐচ্ছিক জীববিদ্যা**। পড়ে অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ পাল।

ভবিষ্যতের ইচ্ছের কথা বলতেই অমিতাভ চটপট জবাব দিল, ও ভবিষ্যতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়।

'আনন্দমেলা' অমিতাভ নিয়মিত পড়ে। কমিক্স আর লেখাপড়া বিভাগের লেখা খুব ভাল লাগে।

এবার এলো
ক্লিয়ারাসিল দীপ্তি
নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান
যা বাড়তি তেল দূর করে দিয়ে আপনাকে দেয়
এক পরিস্কার, ঝলমলে উজ্বল, রং রূপ!
নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান...ঠিক এমন সাবান দিয়ে আপনি আগে কখনো স্নান করেন নি। কারণ, অন্যান্য সাবানের থেকে আলাদা এই নতুন। ক্লিয়ারাসিল সাবানের অফুরন্ত ফেনা আর বহুক্ষণ থেকে যাওয়া সুগন্ধ আপনার ভালো লাগবে তাই নয়...তার সাথে আপনার ত্বককে ক'রে তুলবে আরো সতেজ!
কারণ, এর বিশেষ উপাদান ও অফুরন্ত ফেনা আলতো ভাবে ধুয়ে দেয় আপনার রোমকূপে জমা বাড়তি তেল, যাতে আপনার ত্বককে দেখায় আগের থেকে আরো পরিস্কার ও ঝকঝকে আর ত্বকে ফুটে ওঠে ক্লিয়ারাসিল দীপ্তি!
NEW!
Clearasil
soap for oily skin
gives a clear, glowing complexion
Clearasil
তৈলাক্ত ত্বকের জন্য নতুন ক্লিয়ারাসিল সাবান

সম্পূর্ণ উপন্যাস

ভীষণ বিপদ

হিমানীশ গোস্বামী

কতকগুলো লোককে দেখলেই মনে হয় তারা খারাপ, খুব খারাপ। তাদের সঙ্গে কথা বলতেও ইচ্ছে করে না বিরুর, কিন্তু সেই রকমই একটা অপছন্দ হওয়ার মতো লোক এসে হঠাৎ তাকে জিজ্ঞেস করল এক শীতের সন্ধেয়, "হ্যাঁ বাবু, দীপেন ভট্টা-ভট্টা-ভট্টা …।" তারপর একটু ঢোক গিলে সামলে নিল তার তোতলানো ভাব, এবারে স্পষ্ট করেই বলল, "ভট্টাচার্যের বাড়িটা কোথায় ?" একটু আলো এসে পড়ছে রাস্তায়। কর্পোরেশনের আলো নয়, সুরেনমেসোর দোতলার কাঁচের জানলা দিয়ে আলোটা আসছে। ভেসে আসছে বোধহয় টেলিভিশনের কোনও প্রোগ্রামের চাপা একটা সঙ্গীত। বিরু লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু প্রায় অন্ধকারে সে বুঝতে পারল, লোকটা বেঁটে এবং সম্ভবত খুবই কালো। গায়ে একটা শার্ট এবং পরনে ধুতি। পায়ে একজোড়া চটি। এককালে বিরুকে প্রায় এক বছর অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল, সেই থেকে তার দেখার শক্তিটা একটু বেড়েছে। আওয়াজ শুনেও সে অনেকখানি বুঝতে পারে, যা সাধারণত অন্যরা অগ্রাহ্য করে।

বিরু বলতে যাচ্ছিল, কেন দীপেন ভট্টাচার্যের বাড়িতে আপনার কী দরকার ? কিংবা হয়তো ভেবেছিল দরকারের চাইতে মতলব কথাটাই সে ব্যবহার করবে কিনা। কেননা, দীপ, অর্থাৎ দীপেন ভট্টাচার্য তারই বন্ধু। চারটে বাড়ির পরেই তার নিজের বাড়ি, থাকে জ্যেঠামশাইয়ের বাড়িতে, আর পড়ে কলেজে। ওর বাড়ির পর তিনখানা বাড়ির দোতলার চমৎকার ফ্ল্যাটে দীপেন থাকে। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে নানা কথা ভেবে বিরু কিন্তু লোকটির কথার জবাব দিল না। চুপ করে থাকায় লোকটি একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তা আপনি জানেন না বললেই তো চু-চু-চু-চু-চুকে যেত। খামোখা হা-হা-হা-হাঙ্গামার কোনও দরকার কী ছিল বলেন ?" লোকটির কথায়

একটু যেন উত্তরপ্রদেশের লোকের মতো টান। একবার বিরুরা দু'বছর লখনৌতে ছিল। তখন কয়েকজন উত্তরপ্রদেশীয় লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যাঁরা কলকাতায় যুগ-যুগ ধরে থেকেও বাংলা ভাল করে শেখেননি। এই লোকটিও মনে হল সেই রকমেরই একজন। তবে খুব কেতাদুরস্ত নন। বিরু বলল, সে ঠিক জানে না তার বাড়ি কোথায়। মিথ্যে কথা বলল একটা। বলল, "আমি এ পাড়ায় নতুন, আমি কে কোথায় থাকে জানি না।" লোকটি তখন তার পকেট থেকে একটা লম্বাগোছের কাগজ বার করে বলল, "এর উপর রাস্তার নাম লিখা আছে, ঠিকানাও লিখা আছে, কিন্তু আলো নেই তাই দেখাতে অসুবিধে হচ্ছে। আপনি যদি আপনার বাড়িতে গিয়ে একটু আলো দেখালেন তো খুবই ভাল হোয়। ঠিকানাটা মনে ছিল এখন ভুলে গেছি, খালি রাস্তার নাম মনে আছে।"

বিরু বিরক্ত হল। কিন্তু কী আর করে, সে বলল, "আসুন, আমার সঙ্গে।"

প্রায় পাশাপাশি চলতে চলতে বিরুর মনে হল লোকটির গায়ে যেন কেরোসিনের গন্ধ! হ্যাঁ কেরোসিনেরই। লোকটি কেরোসিনের দোকানদারও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। অন্য অনেক কারণেই কারও পোশাকে কেরোসিনের গন্ধ থাকতে পারে। হয়তো লণ্ঠনে কেরোসিন ভরতে গিয়ে কিছুটা লেগে থাকতে পারে। অল্প একটু হেঁটে বিরু তার বাড়িতে পৌঁছে গেল। দরজায় কড়া নাড়তেই বুড়ো নারায়ণ দরজা খুলে দিয়েই বলল, "দীপেনবাবু—" কিন্তু তারপরই সঙ্গে লোক দেখে বলল, "এ কে বিরুবাবু?" লোকটি কিন্তু অকস্মাৎ নারায়ণের মুখে দীপেনবাবুর নাম শুনে কেমন যেন চমকে গেল বলে মনে হল। বিরু একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, দীপবাবুর ঠিকানাটাই তো এঁর দরকার। খামের ওপর লেখা আছে, দেখি, পড়ে দেখি।"

লোকটি তখন বলল, "বহুত দরকার দীপেনবাবুর সঙ্গে, বহুত তাড়াতাড়ি দরকার।"

বিরু তখনও ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। নারায়ণ কী বলতে চাইছিল? কিন্তু সে-কথা এখন জিজ্ঞেস করা যাবে না। লোকটি সন্দেহ করেছে কিছু। আমি দীপেনের বাড়ি কোথায় জানি, নাম জানি, এটা বুঝতে তার কোনও কষ্ট হওয়ার তো কথা নয়। লোকটা কী ভাবছে কে জানে। এইবার বিরু লোকটির দিকে তাকিয়ে দেখল, হ্যাঁ বেশ কালোই চেহারা। কানে আবার মাকড়ি! চুল ছোট করে ছাঁটা, পুলিশদের এরকম হয়, আবার জেলে যারা থাকে, তাদেরও চুল ছোট হয় অনেক সময়। বিরু বলল, "দেখি চিঠিখানা।" দেখল, একটা হিন্দি খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার উপরের দিকে যে কিছু জায়গা খালি থাকে তাতে হিজবিজ বাংলা অক্ষরে কী যেন লেখা। লোকটি বলল, "পড়ে দেখুন, কী লেখা আছে। কোনও সাঙ্ঘাতিক বেপার কিছু হোতে পারে। আমি ডেলহাউসির জিপিও'র কাছে একটা অ্যামবাসাডর গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেখি তার মধ্যে একটি ছে-ছে-ছে-ছেলে বসে আছে, আর কী লিখছে পিছনে রাখা একটা প্যাকেটের কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে। তাড়াতাড়ি লিখে আমাকে বলল, ওর বিশ্রী বিপদ, তাড়াতাড়ি এই চিঠিটা ঠিকানায় পৌঁছে দিলেই তিরিশ টাকা পাওয়া যাবে। ওর সামনে ড্রাইভার ছিল, সে সামনে কী লক্ষ করছিল কে জানে, আমাকে দেখতে পায়নি। আর ওর পাশে একটা মোটা লোক বসে-বসে ঘুমোচ্ছিল, কিন্তু তার একটা হাত দিয়ে ছোকরাটির হাত ধরে ছিল। দু'মিনিটও লাগেনি। আমার ম-ম-ম-মনে হয় বি-বি-বি-বিশ্রী বিপদ কুছ··· ।"

বিরু তাড়াতাড়ি চিঠিটা নিয়ে পড়তেই তার যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। আজ সকালেও দেখা হয়েছে শ্যামল ভদ্রের সঙ্গে। তার সহপাঠী। সে লিখেছে: দীপক, আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, সেই তারা। কোথায় জানি না, পুলিশকে খবর··· তারপর নাম লিখেছে শ্যামল ভদ্র।

বিরু বলল, "কই, ত্রিশ টাকার কথা তো লেখা নেই!"

লোকটি বলল, "না, সেটা খোকাবাবু নিজে বলেছে।"

বিরু বলল, "সেটা কোনও ব্যাপার নয়। ওই টাকা দিতে অসুবিধে নেই। কিন্তু হয়েছেটা কী? ক'দিন ধরেই দীপক আর শ্যামল কতরকম শলা-পরামর্শ করছিল। কী যে সে পরামর্শের বিষয় তা বিরু জানে না। বিরু কেবল জানে, বিষয়টি অতিশয় গোপনীয় এবং তাতে যেমন বিপদ আছে তেমনি প্রচুর লাভেরও সম্ভাবনা।

বিরু ওই লোকটিকে তার বাড়িতে বসিয়ে তাড়াতাড়ি দীপকের বাড়িতে গেল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাদের বাড়ির ছোট্ট স্পিটজ কুকুর টাইনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। দীপকের বাবা অমরবাবু তখন বৈঠকখানায় বসে দু-একজনের সঙ্গে তাস খেলছিলেন। প্রায় প্রতি সন্ধেয় ওঁরা তাস, দাবা খেলেন, দারুণ আড্ডা বসে সেখানে। অমরবাবু চিঠিটি পড়েই উত্তেজিত হয়ে পড়েন। বললেন, "সে কী! সে তো সেই সকালে কলেজে গেছে, তারপর থেকে আসেইনি বাড়িতে! অবশ্য বলে গিয়েছিল দেরি হতে পারে।"

"তাই নাকি?" বিরু বলল, "কিন্তু আজ আমি তো কলেজে তাকে একবারও দেখতে পাইনি।"

অমরবাবু বললেন, "তা পাবে কেন? বাবু যে রোজ কফি হাউসে বসে আড্ডা মারেন! কিন্তু এ কী বলছ তুমি, একজন লোক এই চিঠি এনে দিল আর তুমি তাকে বসিয়ে রেখে এলে? লোকটি ওদেরই দলের লোক হতে পারে তো? যারা ধরে নিয়ে গেছে শ্যামলকে? তা ছাড়া ওরা কারা তাও তোমার জানা, তাই না বিরু?"

বিরু বলল, "না, আমি ঠিক···" বিরু আমতা-আমতা করতে লাগল।

অমরবাবু বললেন, "আমি ঠিক··· যতই বলো না কেন, তুমি জানো কিছু। ওদের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব। দীপক ছাড়া তোমার চলে না, দু'জনে এত বন্ধুত্ব। তারপর শ্যামলকেও তো তুমি চেনো, চেনো না?"

"হ্যাঁ কাকা, চিনি," বিরু বলল, "কিন্তু ওরা অন্য কাদের সঙ্গে কীভাবে জড়িত তা জানি না, সত্যি বলছি। তবে মাসখানেক হল ওরা কী-সব পরামর্শ করত। ও গেলেই তারা অন্য কথা পাড়ত। বলত, তুই গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলি, তোর পা এখনও দুর্বল, যা আমরা করতে যাচ্ছি তা তোর পক্ষে সম্ভব হবে না।" ওইটুকুই, তার বেশি সে জানে না। কথাটা কাউকে বলতেও বারণ করে দিয়েছিল।

অমরবাবুর বয়স হবে পঁয়তাল্লিশ বছর। রোগা, লম্বা চেহারা, সরু গোঁফ। ফরসা রং। চোখে খুদে-খুদে প্রাচীন ধরনের সোনালি রঙের কিংবা সোনারই চশমা। বেশ শৌখিন

মানুষ বলে মনে হয়। এতদিন বিরু ওঁর এত কাছে আসেনি, কিন্তু এবার তার মনে হল অমরবাবু নিশ্চয়ই নস্যি নেন। সে নস্যির গন্ধ পেল। অমরবাবু বললেন, "ওই লোকটি গুণ্ডা দলেরই কেউ হবে। চলো, চলো, আগে পুলিশে খবরটা দিয়ে তারপর অন্য সব।" অমরবাবু বললেন, "সুরেশ্বর, তুই এক কাজ কর তো, লালবাজারের অখিলেশকে একবার···। থাক এখন দরকার নেই। আগে চল্ বিরুর ওখানে। লোকটিকে আগে জেরা করা দরকার।"

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চার-পাঁচজন মিলে যখন বিরুর বাড়িতে পৌঁছল তখন দেখা গেল লোকটি নেই। নারায়ণ বলল, "লোকটি প্রথমে বলল তার খুব তেষ্টা পেয়েছে। তাকে এক গেলাস জল এনে দিলাম। এক চুমুকে সে শেষ করে বলল, 'এতে কী হবে ? আরও একঘটি নিয়ে এসো।' আমি আবার জল এনে দেখি লোকটা উধাও হয়ে গেছে !"

অমরবাবু বললেন, "ঠিকই অনুমান করেছিলাম। ইশ্ ! লোকটাকে ধরে রাখা উচিত ছিল। বিরু, তুমি যে এতখানি নির্বোধ হতে পারো সে ধারণাই আমার ছিল না। লোকটি যদি ওদের লোক হত তা হলে তো উত্তম, সব ফাঁস করে দিতে বাধ্য হত। আর যদি সত্যিই সে, তুমি যা বলছ, একজন সাধারণ মানুষ, তা হলে ওর কাছ থেকে কত খবর নেওয়া যেত। যেমন ধরো গাড়ির রঙ, গাড়ির নম্বর, দীপকের পাশের লোকটির বর্ণনা, ড্রাইভারের চেহারা, ভাবভঙ্গি ! বুঝতে পারছ এরা ছেলেধরার দল। বোকার মতো শ্যামল ধরা পড়েছে, দীপককেও ওরাই ধরেছে।"

এবারে বিরু বলল, "কিন্তু কাকা, যে লোকটি এসেছিল সে ওদের লোক হলে তো জানতেই পারত দীপক নেই। কেননা, আপনি বলছেন দীপককেও ওরা ধরেছে, তা হলে শ্যামলের চিঠি কেন ও নিয়ে আসবে ?"

অমরবাবু মাথায় হাত দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন, "এইটেই তো ওদের চালাকি !"

কিন্তু চালাকির ব্যাপারটা বিরুর মাথায় ঢুকল না। চালাকি ? কিসের চালাকি ? এই চালাকিতে কার কী লাভ ?

অমরবাবু বললেন, "এইবার আসবে চিঠি, পঞ্চাশ হাজার টাকা বা লাখ টাকার দাবি জানিয়ে। শিগ্‌গির পুলিশকে খবর দিতে হচ্ছে !"

বিরু বলল, "কিন্তু এখনই কি ধরে নেওয়া যায় যে, দীপককে ওরা চুরি করেছে ? সেটা না হতেও তো পারে। ওরা শ্যামলকে চুরি করেছে সেটা না-হয় ধরে নিচ্ছি, যদিও ওঁর হাতের লেখা কেমন আমাদের কারও জানা নেই। ওটাও একটা শয়তানি হতে পারে। এখন দেখতে হবে শ্যামল বাড়ি ফিরেছে কি না।"

"শ্যামল তো থাকে সেই খালের ওপারে কোথায় কোন্ বুনো জায়গায়, তাই না ?" অমরবাবু বললেন।

কলকাতার মধ্যে যাঁরা থাকেন তাঁদের এই একটি দোষ আছে বিরু তা অনেক সময়েই লক্ষ করেছে—যাঁরা পাইকপাড়া কিংবা বরানগরে থাকেন তাঁরা যেন কলকাতারই লোক নন এবং মানুষও নন পুরোপুরি, তাঁরা এইরকম ভাব প্রকাশ করেন। অবশ্য সবাই ও-রকম নন, কেউ-কেউ আবার খুব চমৎকার লোকও রয়েছেন। মানুষের অনেক অদ্ভুত মনোভাব বিরুকে মাঝে-মাঝে উদাসীন করে তোলে।

॥ দুই ॥

শ্যামল ভদ্রের বাড়িটা কলকাতার বাইরে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে যখন শ্যামলের ঠাকুর্দা মাধব ভদ্র পাঁচ কাঠা জমি তিনশো টাকায় কেনেন তখন তিনি বা তৎকালীন অন্য কেউই অনুমান করতে পারেননি যে ভবিষ্যতে ওই জমির অত চাহিদা হবে, এবং ১৯৮০ সালে তিন কাঠা জমি বিক্রি করেই পাওয়া যাবে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা ! শ্যামলদের অবস্থা কিন্তু তাতেও খুব ভাল হয়নি। ওই টাকার অর্ধেকই খরচ হয়ে গেছে পুরনো দোতলা বাড়িটি কেবল মেরামত করতেই। বাকি টাকাটা বিভিন্ন কোম্পানিতে রেখে সুদ এবং শ্যামলের বাবার সামান্য পেনসন হচ্ছে তাদের সাতজনের পরিবারের প্রধান আয়। শ্যামলের বাবা অবিনাশ ভদ্র এ ছাড়া ছাত্র পড়ান এবং কখনও কখনও জমিরও দালালি করেন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে।

অবিনাশবাবুর রোগা, সিড়িঙ্গে চেহারা, ময়লা চাদর গায়ে, নড়বড়ে চশমায় ছোট-ছোট চোখ। তিনি বললেন, "কী জানি কী হতে পারে। এখনও তো আসেনি সে বাড়িতে।" চিঠি দেখে বললেন, "লেখাটা ওরই বলে মনে হয়। শ্যামল কথাটা লিখে যে নীচে একটা বড় দাগ মারে, সেটা সে করেছে। অক্ষরগুলো যেন ওরই লেখা। কিন্তু ওকে চুরি করবে কে, কেন ? আমাদের তো এই অবস্থা, দু'বেলা কোনওমতে সংসার চলে। যদি লাখ টাকা চেয়ে চিঠি দেয় তা হলে আমাদের তা দেওয়ার কোনও উপায় নেই। এমনকী দশ হাজার টাকাও নয়। কলেজে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলাম, ছাত্র ভাল ছিল। শুনেছি পড়াশুনো ভালই করে, তবে পরীক্ষায় কিছু হতে পারলে তবে তো ? কদিন আগে থেকে কীরকম আনমনা হয়ে ছিল সেটা লক্ষ করেছি আমরা। আমরা কথাটা ঠিক নয়, ওর মা। কেমন যেন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব। একটু খেয়েই উঠে পড়ে, সেই সকালে বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধের পর। তবে খিদে থাকে না, বলে, 'বাইরে খেয়ে এসেছি।' কোথায় তা বলে না। আজ এখনও আসেনি। এত রাত কখনও করে না। ন'টা বেজে গেছে না ! সাড়ে ন'টা ?"

হড়বড় করে বলে চললেন অবিনাশবাবু। হাত একটু-একটু কাঁপছে। অমরবাবু বললেন, "দীপকের কথা কিছু বলত ?"

ঝাল ঝাল লঙ্কা আর টকমিষ্টি টমেটোর মিশ্রণ।

এবং তখন-ই দারুণ সব ঘটনা ঘটতে শুরু করে।

কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস।

এতে সব কিছুই আছে — মুখে জল আনার মতো ঝাল ঝাল স্বাদ যা আপনার রসনাকে তৃপ্তি দেবে আর এর সব-টুকুই আপনার চেটে-পুটে খেতে ইচ্ছে কর'বে।

একাধারে ঝাল ঝাল স্যসের স্বাদ

লালচে টমেটোর রসের সঙ্গে ঝাল ঝাল লঙ্কা মিশিয়ে তার ওপর খানিকটা গরম মশলা ছড়িয়ে দিন। কিসানের স্যস তৈরীর অনন্য অভিজ্ঞতা আর কারিগরী ক্ষমতা থাকায় এই অপূর্ব স্বাদ সারা পৃথিবীতে আর কোথাও পাবেন না।

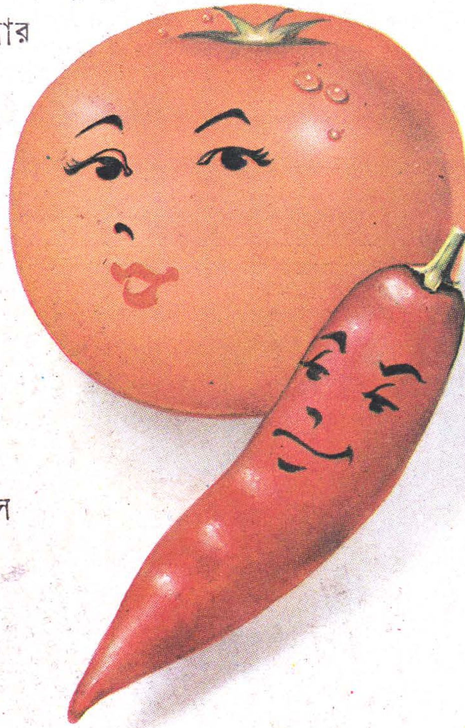

প্রথম স্বাদেই একেবারে কাৎ

অরুচি দূর ক'রতে আপনার মুখ বদলান। আপনার মনের মতো সব খাবারগুলোতেই কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস মিশিয়ে নিন। খেতে ব'সে দেখবেন এটি না হ'লে আপনার আর চ'লবেই না।

আর দ্বিধা ক'রবেন না। কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যস চেখে দেখুন! অন্য কোন স্যস আপনার পছন্দ মতো খাবারকে বা যে কোন খাবারকে এত সুস্বাদু এবং রুচিকর ক'রে তোলে না।

আজ থেকেই শুরু ক'রুন। এটি না হ'লে আপনার আর চ'লবেই না।

কিসানের নতুন টমেটো চিলি স্যসে
এই স্যসের কোন বিকল্প নেই।

প্রথম টমেটো আর লঙ্কা মিশ্রণের স্যস ৫০০ গ্রামের বোতলে!

OBM 2004 Ben

"দীপক ? হ্যাঁ, সে তো মাঝে-মাঝে এখানে এসেছে। দু-একদিন দুপুরে এখানেই খেয়েছে।"

এ-কথায় অমরবাবু খুবই বিচলিত বোধ করলেন। এখানে কেউ থাকতে পারে এটাই তাঁর ধারণার বাইরে। এখানে কেউ বেড়াতে আসতে পারে, বিশেষ করে দীপক, সেটাও কেমন করে হয় তা বুঝতে পারেন না। ছেলেটির উপর তাঁর আর আস্থা থাকে না। তার উপর যদি এইরকম কেলেঙ্কারি বাধিয়ে থাকে তা হলে আর এক চিত্তির।

অমরবাবু বললেন, "এখন আপনি কী করবেন অবিনাশবাবু ?"

এখন কেবল অবিনাশবাবু নন, তাঁর স্ত্রী, তাঁর দুই নাবালক পুত্র, এক কন্যা এবং অবিনাশবাবুর পিতা প্রায় আশি বছরের ক্ষীণকায় বৃদ্ধ মাধব। এ ছাড়া পাড়া-পড়শির সংখ্যাও কম নয়। একটা চাপা উত্তেজনা, ফিসফিস কথা, তবে যথেষ্ট সংযত। প্রতিবেশীরা এসেছেন বাড়ির সামনে একখানা গাড়ির আকস্মিক আবির্ভাবে। এ বাড়িতে স্মরণকালের মধ্যে কোনও গাড়ি আসেনি, এ পাড়াতেই গাড়ির দেখা পাওয়া একটা স্মরণীয় ঘটনা।

গাড়িখানা অমরবাবুরই। তিনি এখানে আর এক মুহূর্তও থাকতে চাইছেন না। এই পাড়া তাঁর কাছে অসহ্য। উদ্বাস্তু কলোনির মতো পিলপিল করছে লোক। এমন চেঁচিয়ে সব কথা বলে, এমন ভাবভঙ্গি সবার। কয়েকটি ছেলে তাঁর গাড়ির ভেতর উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, কেউ বনেটে এবং অন্যত্র হাত বুলোচ্ছে, যেন গাড়ি নয়, ওটা মোষ কিংবা গোরু ! রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টের আলো বেশ জোরালোই। এত আলো তিনি কলকাতার বাইরে এই শহরতলিতে কখনওই আশা করেননি। তিনি বিরক্ত হয়ে দূর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, "এই, গাড়ির গায়ে হাত দিও না ! হাত দিও না !" ছোটরা সেই আওয়াজ শুনেই সরে দাঁড়াল। একটা ছেলে, বোধহয় বছর পাঁচেক তার বয়স, সে হি-হি করে হেসে উঠল, আর গাড়ির গায়ে হাত লাগিয়েই দাঁড়িয়ে রইল।

অমরবাবু ভাবলেন তাকে ধরে এক চড় বসিয়ে দেন। কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সম্বরণ করলেন। বললেন, "এবারে যাওয়া যাক। এখানে থেকে কোনও লাভ নেই।"

অবিনাশ ভদ্র বললেন, "আপনাদের জন্য চা একটু···এই প্রথম এলেন ···হয়েই গেছে তৈরি প্রায়।"

অমরবাবু বললেন, "এখন সময় নেই মশাই, ছেলের খোঁজ করতে এখন সারা কলকাতা চষতে হবে। পুলিশকে এখনও জানানো হয়নি···। শ্যামলের খোঁজ পেলে আমার বাড়িতে একবার জানাবেন। আমার ফোন নম্বরটা লিখে নিন, আমি জানতাম না আমার ছেলের আপনার ছেলের সঙ্গে এমন দহরম-মহরম।"

ভাবটা এই যে, জানতে পারলে তিনি দারুণ এক ব্যবস্থা নিতেন।

এমন সময় তাঁর বাঁ হাতে হঠাৎ ভিজে-ভিজে কী যেন লাগাতে তিনি চমকে লাফিয়ে উঠলেন। দেখলেন কালো রঙের একটা সামান্য, অতি সাধারণ কুকুর একটু বন্ধুত্ব দেখানোর জন্যই তাঁর হাত চেটে দিয়েছে !

অমরবাবু একটা ঢিল তুলে নিতেই চতুর কুকুর সেটা বুঝে হুঁ-উ-উ করে একটা আওয়াজ তুলে সেখান থেকে সরে পড়ল।

এরপর সাদা রঙের অ্যামবাসাডর গাড়িটি স্টার্ট নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল। অমরবাবু গাড়ি চালাচ্ছেন, পাশে অমরবাবুর বন্ধু পালিত, পেছনের আসনে বিরু এবং অমরবাবুর আর-এক বন্ধু ঘোষ।

অমরবাবু বললেন, "ছেলেটাকে ঠিক সময়ে কঠোর শাসন করা হয়নি, তাই এইসব নীচ লোকেদের সঙ্গে মিশে কী হয়ে গেল।"

পালিত বোধহয় অতটা কঠোর নন। তিনি বললেন, "তুমি ভাবতে পারবে না, অমর, দেশটা কোথায় চলে গেছে।"

অমরবাবু বললেন, "লোকগুলো কি অসভ্য দেখছিলে ? গাড়ির গায়ে ছোকরারা হাত বুলোচ্ছিল কিন্তু কেউ বারণ পর্যন্ত করছিল না। এইভাবেই তো ছেলেরা শিক্ষা পাচ্ছে !"

ঘোষ বললেন, "এখন দেখতে হবে দীপক কোথায় গেল। দীপক এবং শ্যামলকে কি একই সঙ্গে একই দল ধরে নিয়ে গেছে ? নিয়ে গেলে উদ্দেশ্য কী হতে পারে ?"

পালিত বললেন, "হতে পারে ওরা ওই দুষ্কৃতকারীদের কারও কুকর্ম দেখে ফেলেছিল তাই তারা তাদের হয়তো··· ।"

বাকি কথাটা তিনি বলতে পারলেন না অমরবাবুর কথা ভেবে।

"থামলে কেন, বলো না ওরা ওকে হয়তো মেরে ফেলবে।" অমরবাবু বললেন, "তা যদি করে আমি অন্তত আশ্চর্য হব না। এই দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কৌশল যে রপ্ত করতে পারবে না তাকে শাস্তি পেতেই হবে··· ।"

বিরুর এইসব কথাবার্তা ভাল লাগছিল না। চার বছর আগে সে উত্তরপ্রদেশের এক গ্রামে আমগাছে উঠেছিল কাঁচা আমের লোভে। সেখানে উঠে সে বুঝতে পারে তার আগমন বহু লাল পিঁপড়ের মনঃপূত হয়নি। কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই। দু-চার ডজন পিঁপড়ের কামড়ে ঝালাপালা হয়ে সে একটা ডাল ধরে ঝুলে পড়ে তাড়াতাড়ি অন্য একটা ডালে পা দিতে গিয়ে পিছলে প্রায় বারো ফুট উপর থেকে পড়ে তার পা ভাঙে। বহুদিন লাগে তার পায়ের হাড় জোড়া লাগতে। তারপর আরও বেশ কয়েক মাস তাকে নানারকম ব্যায়াম করতে হয় নিয়মিত। এখন সেরেই গেছে, কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, মাঝে-মাঝে ব্যথা হতে পারে। এখনও তো শরীর বাড়ছে, সেজন্য জোড়ের জায়গাগুলো একইভাবে বাড়তে পারে না। তবে কয়েক বছর পর আর ব্যথা হবে না। কয়েকটা ব্যায়াম তাকে এখনও করতে হয়। এখন হঠাৎ তার বাঁ পা'টা ব্যথা করতে শুরু করল। বেশ তীব্র ব্যথা। এরকম হয়তো দু-তিন ঘণ্টা থাকবে। যাতে ব্যথা কমে তার একটা মালিশ আছে আর একটা বড়ি আছে ! কিন্তু তার কাছে নেই। সে চুপ করে রইল কোনও কথা না বলে। গাড়ির অন্য কথাবার্তা তার কানেই এল না।

মাঝে-মাঝে ভাবতে লাগল শ্যামল আর দীপকের কথা। আচ্ছা, যদি ওদের ওরা মেরেই ফেলে ?

॥ তিন ॥

দুঃসাহসী তরুণ চাই। যারা জীবনে উন্নতি করতে চায়, যারা পরিশ্রম করতে পারে, যারা প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় আগ্রহী, যাদের স্নায়ুর জোর বেশি, তাদের পক্ষে সুবর্ণ সুযোগ। আবেদন করুন, তারপর একটা বক্স নম্বর, এবং একটা খবরের

কাগজের নাম। এটি একটি বড় দৈনিক কাগজেই প্রকাশিত হয়েছিল। কাউকে না জানিয়ে শ্যামল আবেদন করেছিল নির্দিষ্ট বক্স নম্বরে। এবং কাউকে না জানিয়ে দীপকও তাই করেছিল। একদিন পরস্পর কথাবার্তার সময় দু'জনেই জানতে পারে দু'জনের আবেদন করার কথা। আবেদন করার পর একমাস কোনও খবর নেই, তারপর হঠাৎ দু'জনেই একই ধরনের চিঠি পেল। চিঠির উপরে লেটারহেড দেখে চমৎকৃত হল দীপক। ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি, ফরেন সার্ভে অ্যাণ্ড রিসার্চ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলকাতা। এই লেটারহেডে বেশ চোস্ত ইংরেজিতে লেখা, বুধবার সকাল সাড়ে দশটায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কেন্দ্রীয় হলে আসুন। চিঠিতে আরও বলা হয়েছিল, বিষয়টি ভারতের নিরাপত্তার ব্যাপারে সম্পূর্ণ গোপনীয় এবং কাউকে একথা জানানো চলবে না। ওই একইরকম চিঠির কাগজে শ্যামলকে দেখা করতে বলা হল বিকেল সাড়ে-চারটের সময়। দুটি চিঠিতেই লেখা ছিল, চিঠি সঙ্গে আনতে। শীতকাল, সকালেও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে বেশ জনসমাগম। বাস্তবিক এই প্রাসাদটি যদিও তৈরি হয়েছিল এক বিদেশী রানির স্মৃতিতে, তবু এর সৌন্দর্য চমৎকার তা বলতেই হবে। অনেকে অবশ্য বলেন এটার স্থাপত্য মোটা দাগের, এর মধ্যে তাজমহলের মতো আশ্চর্য করে দেওয়ার কিছু নেই। ভিড়-ভর্তি কলকাতার পক্ষেও যেন এটা বেমানান। কিন্তু তবু এর মতো কিছু পূর্ব ভারতে আর কিছুই হয়নি। আর তাজমহলের সঙ্গে তুলনা করলে কোন্ স্থাপত্যই কেবল ভারতে কেন, পৃথিবীতেই তাকে টেক্কা দিতে পারে? তবে কথাটা ভারতবাসী হিসেবেই বলতে হয়। পৃথিবীতে কত প্রাসাদ কত স্মৃতিসৌধ রয়েছে, অনেকগুলিই অনন্যসাধারণ। তুলনা না করাই ভাল।

এইসব কথা মনে হচ্ছিল দীপকের। বেলা তখন এগারোটার কাছাকাছি। এর মধ্যে একজন বয়স্ক মোটাসোটা লোক তার কাছে এসে বলল, "দীপক ভট্টাচার্য?" লোকটি বাঙালি। চোখে কালো রঙের চশমা। মুখে মৃদু হাসি। বলল, "গায়ে জোর আছে মনে হচ্ছে। মনের জোর কেমন? আচ্ছা সেটা আমরা পরীক্ষা করে নেব। প্রথমে তোমাকে নিয়ে যাব একটি জায়গায় যেখানে মাত্র দু'ঘণ্টা একটা পরীক্ষা দিতে হবে তোমাকে। যেহেতু বিষয়টি গোপনীয় সেজন্য গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে এবং চোখে পরিয়ে দেওয়া হবে কালো চশমা। রাজি তো?"

ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পুব দিকের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দীপক দেখল তার সঙ্গে আরও দু'জন বেশ শক্তিশালী লোক নামছে। সে প্রথম লোকটিকে প্রশ্ন করল, "এঁরা কারা?" প্রথম লোকটি জানাল, "ওঁরাও একই ডিপার্টমেন্টের। কোনও ভয় নেই।"

ভয়ের কথা দীপকের মনেও হয়নি। কিন্তু যেই ওই লোকটি বলল, ভয় নেই, তখনই তার হঠাৎ মনে হল, কেন ও কথাটা বলল? এর মধ্যে কোনও গোলমাল নেই তো? একটু এগোতেই প্রথম লোকটি বলল, "চিঠি সঙ্গে এনেছ তো?" দীপক চিঠিটা পকেট থেকে বার করতেই লোকটি ছোঁ মেরে সেটিকে নিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিল। তারপর তারা সকলে মিলে গিয়ে উঠল একটা অ্যামবাসাডর গাড়িতে। গাড়িতে উঠতেই দু'জন লোক তার চোখের উপর কী একটা ময়দার মতো এঁটে দিল, আর পরিয়ে দিল কালো চশমা। গাড়ি এঁকেবেঁকে চলতে লাগল। প্রায় এক ঘণ্টার পর গাড়িটা একজায়গায় থামল। সে সামান্য কিছুও দেখতে পেল না।

বিকেলে শ্যামলের ভাগ্যেও সেই একই ব্যাপার ঘটল। কেবল ওরা চশমা আর চোখে আঁটবার ময়দা আনতে ভুলে গিয়েছিল বলে প্রথমে ওরা গেল ডালহৌসি স্কোয়ারের জেনারেল পোস্ট অফিসের কাছে। গাড়িটা থামিয়ে রাখল, আর দু'জন কোথায় যেন গেল। ওইভাবে ওখানে প্রায় পনেরো মিনিট কাটল। এই সময় শ্যামলের হঠাৎ মনে হল, এসব এক বিরাট ষড়যন্ত্রের ব্যাপার! তার মনে হল, ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি, ফরেন সার্ভে অ্যাণ্ড রিসার্চের অফিস ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে হবে কেন? তা ছাড়া যদি হয় তা হলে সে-অফিসে দেখা না করতে বলে মেমোরিয়ালের মাঝখানেই বা কেন দেখা করতে বলা? বিষয়টি গোপনীয় হতেই পারে, কিন্তু তাই বলে দফতরটি তো গোপনীয় নয়? আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের অফিস, তাও আবার ফরেন সার্ভে অ্যাণ্ড রিসার্চ সম্পর্কিত! তা ছাড়া সঙ্গের লোকেরা যদিও বেশ ভদ্র পোশাক পরেছে, ব্যবহারেও খারাপ নয়, কিন্তু তাদের হাবভাব তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলল। সে তাড়াতাড়ি একটা প্যাকেট দেখতে পেল, তাতে খবরের কাগজ জড়ানো ছিল। গাড়ির পিছনের জানলার উপর রাখা ছিল। সে সেই কাগজ টেনে নিয়ে চিঠিটি লিখল দীপককে। খুবই অসুবিধে হচ্ছিল এক হাত দিয়ে কাগজ টেনে তাতে লিখতে। একটা হাত তার ধরা ছিল····। সে অবশ্য জানত না ওই একই দিনে দীপককেও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এনে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। চিঠিটি লিখে সে জানালার কাঁচ তুলে একটি লোককে ডেকে বলল, এই চিঠিটা ঠিকানার লোককে পাঠিয়ে দিলে তিরিশ টাকা পুরস্কার! সাধারণ একজন লোক, সে তবু চট করে বুঝতে পারে কোনও একটা বিপদে পড়েছে ছেলেটি। সে তাই লোককে জিজ্ঞেস করতে করতে এসে উপস্থিত হয় বিরুদের রাস্তায়। তার পরের ঘটনার অনেকটাই আগে বলা হয়েছে। লোকটি অবশ্য নিজে বিপদে পড়বে এই ভয়ে এবং ভাবনায় বিরুদের বাড়ি থেকে সরে পড়ে তিরিশ টাকার মায়া ত্যাগ করেই।

॥ চার ॥

দীপক জেগে উঠল। প্রচণ্ড আলস্যে সারা শরীরকে কেমন যেন অসাড় করে দিয়েছে। সে জেগে উঠল বললাম বটে কিন্তু সে কেবল জাগলই, উঠল বলা যায় না, কেননা সে শুয়েই রইল! অবশ্য তার মনে হল, সে যেন কত বছর কিচ্ছু খায়নি! ওকে একটু নড়তে দেখে কে যেন বলল, "কটা বড়ি দিয়েছিলি? মরে যেতে পারত জানিস?" আর একজন বলল, "একটা মরলে ক্ষতি কী, বাঙালি বেকারের অভাব নেই।" প্রথম জন বলল, "ক'জন হল?" অন্যজন বলল, "সবসমেত সাতজনকে পাওয়া গেছে। তার বেশি দরকারও নেই। মামলা তো সাত-আট দিনের।" দীপক এ-কথা শুনে মটকা মেরে পড়ে রইল। বুঝতে পারল কৌশলে তাদের এইভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কী? এমন সময় প্রথম জনের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "ওটা জেগেছে কি জাগেনি? চারদিন হয়ে গেল, এখনও মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে!"

তা হলে চারদিন কেটে গেল এরই মধ্যে? দীপক আড়ষ্ট

হয়ে রইল। তার শরীর দুর্বল হলেও তার মন এখন অনেকটা সতেজ। ঘুম-ঘুম ভাবটা আছেই তবে দ্রুত কেটে যাচ্ছে। সে দ্যাখে সে একটা তোশকের উপর শুয়ে রয়েছে, পাশে একটা কাঁচের গ্লাস, তাতে জল ভর্তি। হ্যাঁ, বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। সে আস্তে, অতি আস্তে উঠে বসল, কিন্তু হাতের ভর সরিয়ে দিতেই হঠাৎ পড়ে গেল বিছানায়। আবার সে চেষ্টা করে উঠল, এবার অধীর আগ্রহে গ্লাসটা নিয়ে পুরোটা খেতে যাবে, কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ল এখন একসঙ্গে বেশি জল খেলে শরীর হয়তো সহ্য করতে পারবে না। কোথায় যেন পড়েছিল সে, মনে পড়ল। সে গ্লাসটা ঠোঁটের কাছে এনে এক চামচের মতো জল মুখে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা তৃপ্তিতে মন খুশি হয়ে উঠল। মনে হল সে বোধহয় দু'গ্লাস জল খেয়েছে! এবার সে অতি ধীরে-ধীরে জল খেতে লাগল। আধগ্লাস জল খাওয়া হলে তার মাথা ঘোরা শুরু হল। কেমন যেন লাগতে লাগল, বমি-বমি ভাব। গলা ঘড়ঘড় করতে লাগল এবং বমি করেই ফেলল খানিকটা, মেঝেতেই। তারপর শুয়ে পড়ল আচ্ছন্নের মতো। এইভাবে চলল তার আধা-জাগরণ আধা-ঘুম। সে যে কতক্ষণ তা তার খেয়াল নেই। এর অনেকক্ষণ পর তার মনে হল দু-তিন জনে মিলে ধরে তাকে একটা খাটে শুইয়ে দিল। তারপর একজন এসে খুব হম্বিতম্বি করে বলল, "কাল বড়দা আসছেন, যদি গড়বড় কিছু হয় তা হলে একেবারে কোতল করে দেবেন। একে দুধ আর ভিটামিন দাও। ডাক্তারকেও তো ডাকা যায় না এখানে!"

একটু পরে কারা যেন বিছানায় তার পিঠে বড়-বড় বালিশ দিয়ে হেলান দিয়ে দিল। একজন একটা গরম জলের তোয়ালে ভিজিয়ে তার সারা গা স্পঞ্জ করে দিতে লাগল। আর একজন তাকে একটা গ্লাসে দুধ খেতে দিল। বলল, "খেয়ে নাও গো, অনেক তো ঘুমিয়েছ ভাই!"

এই লোকটির গলার আওয়াজ একটুও কর্কশ নয়। দীপক তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করল। সে দুর্বলতার জন্য লোকটিকে তেমন স্পষ্ট দেখতে পেল না, তবু চোখে পড়ল তার কাঁচা-পাকা চুল আর খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, এক ইঞ্চির মতোই। লোকটি তার পাশে বসে পড়ল খাটটিতে। বলল, "খোকাবাবু, কাজ শুরু তো হয়ে গেছে, কেবল তুমিই বাদ! অ্যাডভেঞ্চারের কাজ! দুঃসাহসী তুমি, তোমার কি এমন শুয়ে থাকলে চলে? তা ছাড়া কাল ভোরে বড়দা আসছেন। তিনি যদি দ্যাখেন আমরা তোমার মতো একজন দুর্বল ছেলেকে পছন্দ করেছি, তা হলে আমাদের আস্ত রাখবেন না!" দীপক তাতেও উৎসাহ পেল না। সে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তবে তার মনে হল, তার দুর্বলতা দুধ খাওয়ার পর থেকে সামান্য একটু যেন কমেছে।

এইবার সে বুঝতে চেষ্টা করল কোথায় আছে সে। কেন মেঝেয় তাকে শুইয়ে রেখেছিল, এখনই বা তাকে আবার খাটে কেন শুইয়েছে। তার মনে হল, খাট-বিছানা এ-সবই নতুন। একেবারে ঝকঝকে নতুন। মনে হয় নতুন কিনে এনেছে। একটু দূরে দেখল অনেকগুলো ছোট-ছোট চেয়ার, প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা, অনেকগুলো ঢালু টেবিল। দেয়ালের সঙ্গে পরপর সাজানো আছে। একটা ছোট টেবিলও রয়েছে, খুব ছোট নয় অবশ্য, মাঝারি। দেয়ালে একটা বড় মানচিত্র আঁকা, ভারতবর্ষের। এবার সে আন্দাজ করল, এটা বোধহয় ছোটদের স্কুল, যাকে জার্মান ভাষায় বলে কিণ্ডারগার্টেন, আসলে অর্থ হচ্ছে শিশু-উদ্যান। কলকাতায় কত কিণ্ডারগার্টেন দেখেছে দীপক, বাগান কিন্তু দু'একটি ছাড়া কোথাও চোখে পড়েনি! তার মনে হল, ভারতের মানচিত্রের তলায় ব্ল্যাকবোর্ড। হুঁ, ছোটদের স্কুল না হয়ে যায় না! কিন্তু তার মনে হল, ডিসেম্বরের বারো তারিখে তাকে ধরে আনা হয়েছে। আজ কত তারিখ? আজ যত তারিখই হোক না কেন, একটা স্কুল ডিসেম্বরের বারো তারিখ থেকে বন্ধ থাকার তো কথা নয়! বন্ধ না থাকলে চেয়ার-টেবিলগুলো এমনভাবে জড়ো করে রাখা হত না। আর সেও সেখানে দিনের পর দিন মেঝেতে শুয়ে থাকতে পারত না!

একটু আগে সেই খোঁচা-খোঁচা দাড়িওলা লোক তার পাশে একটা টেবিলে এক প্যাকেট চমৎকার বিস্কুট, কিছু খেজুর, একটু আমসত্ত্ব আর একটা ফ্লাস্কে রেখে গিয়েছে। ফ্লাস্কে কফি রয়েছে গরম। সে ফ্লাস্ক খুলে উপরের ঢাকনাটাকে কাপ বানিয়ে ধীরে-ধীরে এককাপ কফি খেয়ে কাপ আর হাত-পা

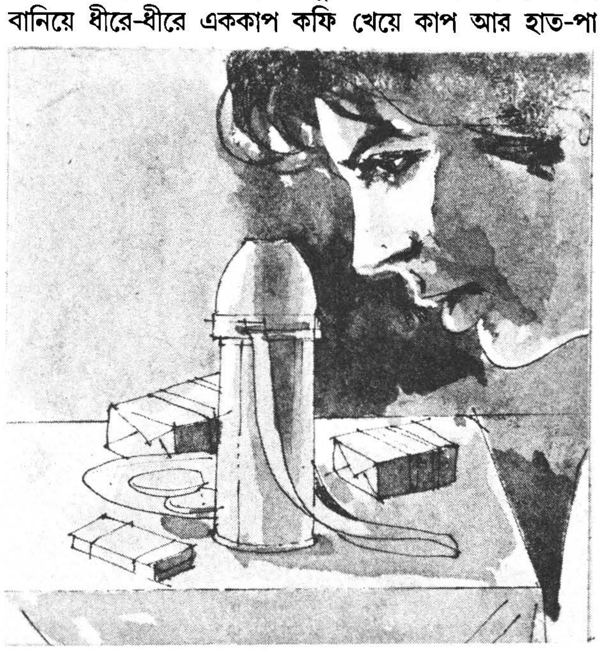

ধোয়ার জন্য বাথরুমের খোঁজ করল। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেল, সেটি পাশেই ছিল। কলঘর থেকে বেরিয়ে সে দেখল বড় এই ঘরটির দুটো দরজা, ঠেলেঠুলে দেখল দুটো দরজাই বাইরে থেকে বন্ধ। খোলার কোনও উপায় নেই। দরজা দুটোরই ভেতর থেকে বন্ধ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। সে বুঝতে পারল তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কথায়-বার্তায় সে জানতে পেরেছে সবসমেত সাতজনকে এইভাবে তারা ধরে এনেছে। বাকি ছ'জনই বা কোথায়? সম্ভবত শ্যামলকেও ধরে এনেছে ওরা। এই বাড়িতে আরও ঘর আছে, হয়তো সেইগুলিতেই তাদের রাখা হয়েছে। দীপক কিছু বুঝতে পারছে না সে কী করবে। একবার জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। চিৎকার করবে সে? চিৎকার? মনে-মনে ভাবল, সে চিৎকার করে জানিয়ে দেবে তাকে এখানে আটকে রেখেছে। তা হলে নিশ্চয়ই লোকজন জমায়েত হবে। তখন আর এদের জারিজুরি খাটবে না। সে দরজায় জোর ধাক্কা দিল দুটো। সঙ্গে-সঙ্গে একজন হুঙ্কার দিল, "গোলমাল করলেই শেষ করে দেব, বুঝলে?"

সে ভাবতে লাগল এখন তাদের বাড়িতে কী চলছে কাণ্ড-কারখানা। মৃত মায়ের কথা মনে হল। মা থাকলে কত উদ্বিগ্ন হতেন। নতুন-মা, প্রায় পনেরো বছর হল ওর বাবা আবার বিয়ে করেছেন, মানুষ খারাপ নন। স্নেহ মায়া মমতা আছে, একটি ছেলেও আছে, আর একটি মেয়ে। ছেলেটি ধ্রুব, তার নাকি ও সৎ-ভাই আর ছন্দা তার সৎ-বোন ! ভাবতেই তার হাসি পায়। তার নিজের মা যিনি ছিলেন, সেই হাসিখুশি মুখ, যা তার মনে পড়ে না, তবে অনেক অনেক ছবিতে সে তার মাকে গম্ভীর বিশেষ দ্যাখেনি, তিনি কি তা হলে সৎ-মা নন, অসৎ ? অসৎ ! না, তা কী করে হবে ? নতুন মা'ও তার খারাপ নন, কিন্তু তিনি কি তার জন্য উদ্বিগ্ন হবেন ? হওয়া কি যায় ? বাবার সঙ্গে দীপকের খুব বেশি মেলামেশা নেই। বাবা বাড়িতে থাকলে তাস-দাবা নিয়েই থাকেন। তাঁর একটু কঠোর স্বভাব। সর্বদাই ছিমছাম থাকেন, থাকতে ভালবাসেন। গাড়ি খারাপ হয়ে যাবে ভেবে ড্রাইভার রাখেন না। আগে একজন ছিল, কিষণ, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছিল সে, একবার দেশে গিয়ে আর ফেরেনি। পরে জানা যায়, সে তার বাড়িতে গিয়েই পৌঁছয়নি। কোথায় সে কী করছে কে জানে। যাওয়ার সময় দু-হাজার টাকার উপর সে জমিয়েছিল, দীপকের বাবার ধারণা ওই টাকার লোভেই কেউ ওকে মেরে ফেলেছে। সেও আজ প্রায় পাঁচ বছর হয়ে গেল। সেই থেকেই বাবা আর ড্রাইভার রাখেননি। নিজেই চালান।

॥ পাঁচ ॥

সুরেশ্বর পালিত লালবাজারের অখিলেশ সেনকে যা-যা প্রয়োজন খুলে বললেন। অখিলেশ সেন বললেন, "এ-সব কেস আজকাল অহরহ হচ্ছে। ছেলে-মেয়েরা পালিয়ে যাচ্ছে, কেউ বোম্বাইয়ে সিনেমার হিরো বা হিরোইন হবার আশায়, কেউ বিদেশে চাকরি দেবে এই লোভ দেখিয়ে একেবারে সর্বস্ব নিয়ে ছেড়ে দেয়। তা অমরের ছেলের তো অভাব ছিল না কিছু, সিনেমার দিকে ঝোঁক ছিল নাকি খুব ?"

সুরেশ্বরবাবু বললেন, "একেবারেই না। পড়াশুনো নিয়ে থাকত। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে ছিল গভীর আগ্রহী।"

"তা অমর এল না কেন, ও নিশ্চয়ই ভেঙে পড়েছে ?"

সুরেশ্বরবাবু বললেন, "না, সেরকম কিছু নয়। জানোই তো ওর সব ব্যাপারেই একটা কেমন ছাড়া-ছাড়া ভাব আছে। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই ওর চরিত্রটা অনেক বদলেছে। এমনিতে খুব শক্ত মানুষ বলে মনে হয়, কিন্তু আসলে সে খুবই দুর্বল।"

সুরেশ্বরবাবু বললেন, "কিছু একটা তো করতে হয়, তিন-চারদিন হয়ে গেল। তুমি কিছুই খবর করতে পারোনি?"

অখিলেশবাবু বললেন, "না, একেবারেই কিছু না। কী জানো ভাই, আমাদের লোকেরাও যে সর্বদা খুব আগ্রহের সঙ্গে কাজ করেন তা নয়। আমি অবশ্য যুধিষ্ঠির দাসকে বলেছি। ছেলেটি উৎসাহী আর চটপটে। সে যেখানে যেখানে যাবার গেছে, যা করবার করেছে। অমর তো কোনও খবরই দিতে পারেনি। কার-কার সঙ্গে মেশে তাও বলতে পারল না ভাল করে। পাড়ার বীরেন সামন্ত ছাড়া দীপকের আর কোনও বন্ধুর নামও সে বলতে পারল না। যুধিষ্ঠির অবশ্য কলেজে গিয়ে কয়েকজনকে প্রশ্ন করেছে, কিন্তু যতটুকু জানা গিয়েছিল তার বেশি এক সেন্টিমিটারও এগোনো যায়নি। শ্যামলের চিঠিটাই ছিল একমাত্র সূত্র। হিন্দি একটি খবরের কাগজের সূত্রে মনে হয়, যারা ওদের চুরি করেছে তারা বাংলার বাইরের। আমরা সর্বত্র অ্যালার্ট করে দিয়েছি, কোনও খবর নেই। বোম্বাই পুলিশকেও টেলিফোনে জানানো হয়েছে। তবে আজকাল তো সিনেমা কেবল বোম্বাইতেই হয় না ! মাদ্রাজেও বড়-বড় স্টুডিও রয়েছে। স্টুডিও রয়েছে ভুবনেশ্বরেও। কিন্তু যদি ওদের চুরি করাই হয়ে থাকে তা হলে এ-দিকটা খোঁজ নেওয়া অতটা জরুরি নয়। একদল লোক ওদের চুরি করে নিয়ে গিয়ে সিনেমায় নামাচ্ছে এটা তো আর হতে পারে না ? তবে বিদেশে যাতে যেতে না পারে সেটা দেখার জন্য বিভিন্ন বিমান বন্দরকে সতর্ক করা হয়েছে। ব্যস্, আমাদের দৌড় ওইটুকুই। তা দীপকের সম্পর্কে কোনও খোঁজ-খবর, অর্থাৎ নতুন তথ্য যদি জানতে পারো, অবিলম্বে জানিয়ে দিও। এ ছাড়া রয়েছে শ্যামল ভদ্রের ব্যাপারটাও। কলকাতায় যে রোজ কত নিরুদ্দেশের ঘটনা ঘটছে তা আর কী বলব। নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনা দৈনিক অন্তত কুড়ি-বাইশটি ! শিশু থেকে শুরু করে আশি বছরের বৃদ্ধ, নিরুদ্দেশ সকলেই হচ্ছে ! বাদ তো কাউকে পড়তে দেখি না। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই..."

এমন সময় টেলিফোনের ঘণ্টা বাজতেই অখিলেশবাবু বললেন, "ইয়েস স্যার। বড়দা ? এখানে এই কলকাতায় !... যাচ্ছি স্যার," বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে কতকগুলি কাগজপত্র নিয়ে বললেন, "আজ আর কথা হবে না—কর্তার ঘরে ডাক পড়েছে, খবর থাকলেই জানিয়ে দিও বা অমরকে জানিয়ে দিতে বোলো। ওর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যেই খোঁজটা বেশি করে...।" কথাটা আর সম্পূর্ণ করলেন না অখিলেশবাবু।

সুরেশ্বর পালিত লালবাজার থেকে বেরিয়েই একটি মিনিবাস ধরলেন।

সংবাদটি খবরের কাগজেও ফলাও করে বেরিয়েছিল। দীপক আর শ্যামলের ছবিও ছাপা হয়েছিল। প্রকাশিত হওয়ার দিন একটি বড় সংবাদপত্রের অফিসের সামনে দেখা গেল একটি জটলা। এক ভদ্রলোক বলছেন, তাঁর ছেলে হিরু হোসেনকেও পাওয়া যাচ্ছে না। কী একটা চাকরির ইন্টারভিউ দিতে এসেছিল কলকাতায়। তারপর সাতদিন কেটে গেছে, কোনও পাত্তা নেই। জানা গেল, ভদ্রলোকের বাড়ি সিউড়ি। প্রথমে ভেবেছিলেন ছেলে চাচার বাড়িতে আছে, কেননা, কলকাতায় এসে কাজে আটকে পড়লে চাচার বাড়িতেই হিরু ওঠে। তা পাঁচ-ছ'দিন কেটে গেল তাও ফিরল না দেখে খুব যখন দুশ্চিন্তা করছেন তখন খবরের কাগজে ওই আতঙ্কজনক খবর পড়ে ছুটে এসেছেন। খবরের কাগজ থেকে বলা হল, দীপকের বাবা কিংবা শ্যামলের বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। থানায় প্রথমে গিয়ে লাভ নেই, কেননা, কেসটা সিউড়ির না কলকাতার, কলকাতার হলে কোন্ থানার ব্যাপার, তার সমাধান করতেই কত দিন কেটে যাবে তার ঠিক নেই। যদি হদিস করতে না পারেন তবে আবার আসতে বললেন হিরু হোসেনের বাবা আলতাফকে।

কিন্তু ব্যাপারটা আরও রহস্যময় হয়ে উঠল পরদিন। সেই সুন্দরবন অঞ্চল থেকে এসেছেন বীরেন সর্দার। উনি অবশ্য একটা চিঠি এনেছেন। ওঁর ছেলে রঘুবীর একটা চিঠি

পেয়েছিল, সেই চিঠির একটা অবিকল নকল করেছিল সে। কাউকে অবশ্য সে বলেনি। তার কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া গেছে। চিঠি পড়ে মনে হয় ওর কোনও একটা আবেদনের উত্তরে চিঠি লেখা হচ্ছে। সে চিঠির উপরে লেখা: ডিপার্টমেন্ট অব আর্কিওলজি, ফরেন সার্ভে অ্যাণ্ড রিসার্চ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলকাতা। চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তা হুবহু দীপকের কাছে লেখা চিঠির মতোই।

বীরেনবাবু খবরের কাগজের সাংবাদিকদের বললেন, তাঁদের পরিবারের আয় কৃষি-নির্ভর। খুব বিরাট কিছু নয়, তবে সম্প্রতি দু-তিন বছর ফসল ভাল হয়েছে, তাই ধারটার প্রায় শোধ করে এনেছেন। এক একর জমি ইজারা নিয়েছেন চিংড়ির চাষের জন্য। "যদি আপনারা যান তো খেয়ে আসতে পারবেন—" এই আমন্ত্রণও তিনি জানাতে ভুললেন না। তিনি বললেন, "ছেলেটি দারুণ গোঁয়ার। হায়ার সেকেণ্ডারিতে অঙ্কে ফেল করেছিল বলে জেদ করে এমন পড়াশুনো করে যে, এ অঞ্চলে অঙ্কে ফার্স্ট হয়, আবার অন্য সব সাবজেক্টেও এমন ফল করে যে, উপরের তিরিশ জনের মধ্যে নামটা থেকে যায় বিজ্ঞান বিভাগে। কিন্তু তারপর আর পড়াশুনো না করে একটা ক্যামেরা কিনে কী সব হাবিজাবি বই নিয়ে থাকত আর কলকাতার সব অধ্যাপকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।" তিনি বললেন, "গায়ের জোরও ওর খুব বেশি। তবে চাষও করল না, পড়াশুনোও করল না। এর মধ্যে এই বয়সেই দেখি, বোম্বাইয়ের দুটো কাগজে ওর লেখাও ছাপা হয়েছে। তা আমি ইংরেজি-ফিংরেজি বুঝি না। কী মাথামুণ্ডু লেখে তাও জানি না। তা আমার তো আরও ছেলে আছে দুটো, সেজন্য ওকে ওর মতেই চলতে দিয়েছি, আপত্তি করিনি। একদিন কেবল বকেছিলাম পড়াশুনো না করে ঘুরে-ঘুরে নিজের শরীর নষ্ট করার জন্য। তা ভেবেছিলাম ওই কারণেই ছেলে আমার পালিয়েছে বাড়ি থেকে অভিমান করে। কিন্তু যখন খবরের কাগজে দেখলাম দু-দুটো ছেলে নিরুদ্দেশ, তখন আমার মনে হল, ব্যাপারটার সঙ্গে কোনও যোগও থাকতে পারে। তাই ওর কাগজপত্রের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে লাগিয়ে দিলাম। ওর একখানা মোটা মানচিত্র বইয়ের মধ্যে এই চিঠির কপিটি পাওয়া গেছে। ওর এক বন্ধুর জেরক্স কপি করার ব্যবসা আছে কাকদ্বীপে, সেখান থেকেই বোধহয় করিয়েছিল।"

ব্যাপারটা অমরবাবুকে জানিয়ে দেওয়া হল। অমরবাবুও খবরের কাগজের অফিসে এসে বীরেন সর্দারের সঙ্গে কথা বললেন। তারপর পুলিশকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হল। পুলিশ জানাল, চিঠিটা মস্ত একটা ধাপ্পা। ওইরকম কোনও ডিপার্টমেন্ট ভূ-ভারতে নেই। সেখান থেকে চিঠি পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই থাকতে পারে না। চিঠি পড়ে এবং রঘুবীরের কলকাতা আসার তারিখ মিলিয়ে দেখা গেল, দিন-ছয়েক আগে রঘুবীরের কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বিকেল চারটের সময় দেখা করার কথা ছিল। দীপক যেদিন হারিয়ে গেছে তার একদিন আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

পুলিশ এবারে একটা সূত্র পেল। সবগুলি নিরুদ্দেশের সঙ্গে এই সূত্রের যোগ আছে কি না সেটা অবশ্য জানা যাচ্ছে না। তবে হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে ঠিকই। এবারে ওই বিজ্ঞাপনটার খোঁজ করা হল। যেদিন প্রকাশিত হয়েছে

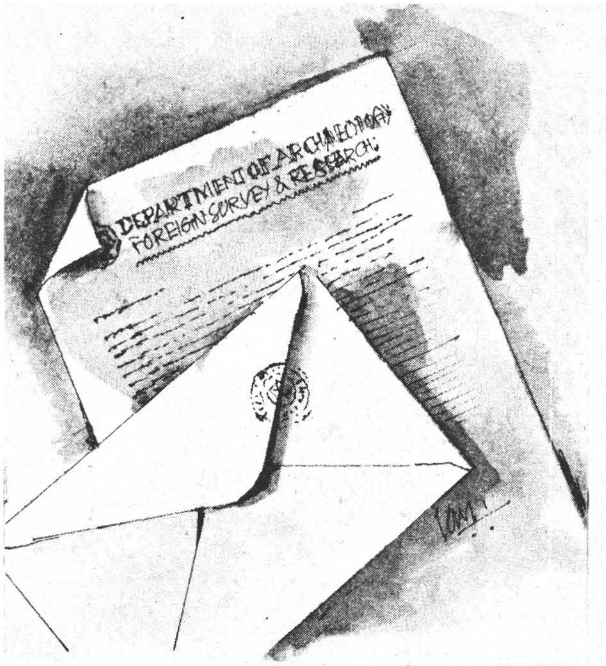

বিজ্ঞাপনটি তার চারদিন আগে বিজ্ঞাপনটি কে একজন দিয়ে গেছে। তারপর তিন সপ্তাহ ধরে অন্তত দুশো চিঠি এসেছে ওই বক্স নম্বরে। বিজ্ঞাপনদাতার নাম দেওয়া আছে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, ১০১ নম্বর প্রাণহরি দত্ত লেন, হাওড়া। পুলিশ হাওড়ার থানায় ফোন করে জানতে পারল ওই নামে হাওড়ায় কোনও রাস্তাই নেই। বিজ্ঞাপন বিভাগের লোকজন অনেক চেষ্টা করেও মনে করতে পারল না, যে বিজ্ঞাপন এনেছিল তার চেহারা কেমন। যে ছেলেটি বিজ্ঞাপনটি নিয়েছিল তার বিজ্ঞাপনটি একটু অদ্ভুত মনে হয়েছিল, এইমাত্র। তবে সে কোনও প্রশ্ন তোলেনি। লোকটির দিকে সে তাকিয়েছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু কিছুই মনে নেই। প্রায় এক মাস আগেকার কথা। কেন মনে রাখেনি এটা ভেবে সে আফশোস করল খুব, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হল না কারওই।

পুলিশ জানাল, ব্যাপারটি সুপরিকল্পিত। এ কথাটা না বললেও কারও বুঝতে অসুবিধে হত না। পুলিশ খুঁজে-খুঁজে দেখল, ওই একটি খবরের কাগজেই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়েছিল, অন্য কোথাও নয়। পুলিশ বিজ্ঞাপনটির কপি সঙ্গে রাখল, হাতের লেখাটি প্রমাণ হিসেবে রাখবার জন্য। পরে প্রয়োজন হলে ব্যবহার করা যেতে পারে বলেও। আদালতে একটা সহজ-সরল ঘটনাও প্রমাণ করতে বেশ হিমশিম খেতে হয়। এ ছাড়া কোন্ প্রেস থেকে এটা ছাপা হয়েছে সেটা জানতে পারলেও সুবিধে হতে পারে। কলকাতায় এবং অন্যত্র অসংখ্য প্রেস খোঁজাও সহজ নয়।

অবশ্য পুলিশের এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করলেন টেলিফোনের মাধ্যমে এক ভদ্রলোক। খবরের কাগজে যখন ওই বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে তখন রিপোর্টের মধ্যে এক উৎসাহী সাংবাদিক চিঠিটিকে ছাপতে পারে, কোন্ প্রেস ইত্যাদি নিয়েও আলোচনা ছিল। তাতে একজন পুলিশকে জানালেন, তিনি হয়তো বিষয়টিতে কিছু আলোকপাত করতে পারেন। পুলিশ তাঁকে দেখা করতে বললে তিনি প্রথমে রাজি হলেন না। বললেন, তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধে আছে। কিন্তু পুলিশ-পক্ষ থেকে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হলে তিনি স্বয়ং এসে পুলিশ অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পুলিশের প্রথমে মনে

হয়েছিল হয়তো প্রেসেরই কোনও কর্মচারী, মালিকের বিষনজরে না পড়ার জন্য এটা করেছেন, কিন্তু দেখা গেল যিনি এলেন তিনি প্রেসেরই মালিক। তিনি বললেন, ওই লেটারহেড তাঁর ছাপাখানা থেকেই ছাপা হয়েছিল মাস-দেড়েক আগে। একজন তিরিশ থেকে চৌত্রিশ বছর বয়সের লোক, দাড়ি-গোঁফ আর লম্বা চুল, দেখেই মনে হয় কবি। চোখে কালো চশমা। তার গা থেকে আতরের গন্ধ বেরোচ্ছিল, আর মনে হয়েছিল বেশ শৌখিন মানুষ। একাই এসেছিলেন এবং মাত্র কুড়ি কপি চিঠির কাগজ ছাপানোর অর্ডার দিয়েছিলেন। ওকে যখন বলা হয় এক হাজার পর্যন্ত ছাপাতে লাগবে পঞ্চাশ টাকা, আর কাগজের দাম আলাদা, আর মাত্র পঁচিশ টাকার কাগজ কিনলেই হাজার চিঠির কাগজ হতে পারে, তখন লোকটি বলল, এটা স্যাম্পেল মাত্র। পরে হাজার-হাজার কপি ছাপাতে হবে, এখন কেবল কর্তাদের দেখিয়ে নিতে হবে। ব্যাপারটা প্রেস-মালিকের কিছুটা অদ্ভুত মনে হয়েছিল তখন, কিন্তু কত লোক কত রকম হয়, আর তা ছাড়া, যারা প্রেসের কাজ করায় তারা কী উদ্দেশ্যে কাজ করায় তা সব সময়ে জানা যায় না। যাই হোক, খুব যত্ন করে কাজটি করিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। না, এ-রকম ক্ষেত্রে নাম-ঠিকানা তিনি রাখেননি। সব টাকাই তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন অগ্রিম। পুলিশ প্রেস-মালিককে ধন্যবাদ জানাল, ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর লিখে রাখল, তারপর ভদ্রলোক চলে গেলে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। কেননা, লোকটি নিশ্চয় ছদ্মবেশ ধরে এসেছিল, কারণ গোঁফ-দাড়ি, লম্বা চুল,তার উপর কালো চশমা! এর পর ওকে চিনতে পারার কথা নয়, ওই চুলের আর দাড়ির বাধা ভেদ করে!

॥ ছয় ॥

বিরুও কয়েকদিন খুব দুশ্চিন্তায় রয়েছে। মাঝে-মাঝেই সে খবরের কাগজের অফিস এবং লালবাজারে ঘুরছে। খুবই মন খারাপ। ওর ওই অবস্থা দেখে ওর জ্যাঠামশাই গোবিন্দপ্রসাদও বেশ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। কলকাতার অনেক বাড়িতেই দীপক, শ্যামলের অন্তর্ধান নিয়ে রোজ আলোচনা হচ্ছে। ভয়ের ঠেলায় আসন্ন বড়দিনের মেজাজই নেই। বিকেলের মধ্যেই বাড়িতে ফেরার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ছোটদের অনেক বাড়ি থেকে, যেন ছেলেধরার দল দিনেরবেলা কাউকে ধরে না! বিরু মাঝে-মাঝে ভাবে সে যদি ডিটেকটিভ হত তা হলে হয়তো অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়ে বার করে ফেলতে পারত একটা সূত্র। কিন্তু সে ডিটেকটিভ নয়, কেমন করে কী করতে হয় তাই সে জানে না। তার উপর তার পায়ের যে ব্যথাটা মাঝে-মাঝে হয় সেটাও তাকে মনমরা করে তোলে। দীপক দু-একবার শ্যামলের বাবার কাছেও গেছে। সেখানকার উদ্বেগ এবং হতাশা দেখে সে যখন দীপকের বাড়িতে যায় সেখানে সে দ্যাখে, কারও যেন বিশেষ কোনও উদ্বেগ নেই। অমরবাবু দুশ্চিন্তিত ঠিকই, কিন্তু ঠিকসময়ে অফিসে যাচ্ছেন, আসছেন। সন্ধেয় তাস খেলাও বন্ধ হয়নি। হয়তো ওঁর কিছু করারও নেই। কেবল হা-হুতাশ করলেই তো ছেলে ফিরে আসবে না। যাদের উপর ভার দেওয়া আছে, সেই পুলিশ অপরাধীদের ধরলে ধরবে ঠিকই, না ধরলে আর করার কী আছে।

পরশু বড়দিন। বিরুর জ্যাঠামশাই (জ্যাঠামশাই ওকালতি করেন) বিরুকে বললেন, "হ্যাঁ রে, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের একটা ব্যাঙ্কে আমাকে আমার এক ক্লায়েন্ট দেড় হাজার টাকার বেয়ারার চেক দিয়েছে, সেই শ্যামবাজারের দিকে। একবার কাউকে নিয়ে গিয়ে টাকাটা তুলে আনতে পারবি?"

বিরু বলল, "নিশ্চয়ই, এটা কোনও কঠিন কাজ নাকি।" কত চেক নিয়ে সে টাকা ভাঙিয়েছে। তার তো নিজের নামেই ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে। সে সব জানে। চেক জমা দিলে একটা চাকতি পাওয়া যায়, তাতে নম্বর দেওয়া থাকে, তারপর আধঘন্টা কিংবা তারও পরে টাকাটা পাওয়া যায়। প্রথমে বেয়ারার চেকের পিছনে সই করে দিতে হয়, আবার চাকতি দিলে সেই চেকের পিছনে অনেক সময় আবার সই করতে বলে, অনেক সময় বলেও না, এমনিই দিয়ে দেয়। ব্যাঙ্ক টাকা দিতে এত দেরি করে কেন তা অবশ্য বিরু বুঝতে পারে না। বিদেশে নাকি একটা চেক দেওয়ার আধ মিনিটের মধ্যেই টাকা পাওয়া যায়। এদেশেও নাকি কয়েকটা ব্যাঙ্কে তাড়াতাড়ি টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু সে ব্যাঙ্ক কোনগুলি, তা বিরু জানে না।

জ্যাঠামশাই বললেন, "যা, টাকাটা নিয়ে আয়। ওই টাকা দিয়ে তোকে একটা টেপ-রেকর্ডার কিনে দেব!" কী মজা! বিরুর যে কী আনন্দ হল তা আর কহতব্য নয়! সে লাফিয়ে উঠে জ্যাঠামশাইকে জড়িয়ে ধরল। জ্যাঠামশাই বললেন, "তোর বাবা বোধহয় জানুয়ারিতে কলকাতাতেই বদলি হবে রে! তখন আরও মজা হবে। এক্ষুনি একটা চিঠিতে জানতে পারলাম।"

এতগুলো মজা! কিন্তু তারপরই সে আবার বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এই বড়দিনের ছুটিতে দীপকের সঙ্গে তার বেড়াতে যাওয়ার কথা ছিল একটা করে ব্যাগ কাঁধে করে। সঙ্গে ক্যামেরা। কেবল বাসে করে সমস্ত উত্তরবঙ্গ ঘুরবে দশদিন ধরে। কিন্তু তা আর হল না। দীপকের কী হল? শ্যামলেরই বা কী হল?

জ্যাঠামশাইয়ের একটা নির্দেশ মানার তার ইচ্ছে ছিল না। কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটায় তার মনে সায় ছিল না। সে তো কম বড় নয়। রীতিমত কলেজে পড়ে! কিন্তু একটু ভয়ও তো আছে, অতগুলি টাকা, তার উপর তার দুই বন্ধু নিরুদ্দেশ। চেনা একটা ছেলে ইস্কুলে পড়ে। কিন্তু পরীক্ষা-টরিক্ষা হয়ে গেছে, এখন টিভি চালিয়ে ক্রিকেট দ্যাখে রোজ, না হলে গল্পের বই পড়ে। ওর নাম প্রহ্লাদ। ওর বাড়িতে দু-তিন শোর উপর গোয়েন্দা-কাহিনী আছে। সেগুলির আবার অর্ধেকের বেশি ইংরেজিতে লেখা। কিছু কিছু সেও পড়েছে, কিন্তু অসম্ভব সব কাহিনী পড়তে ভাল লাগে না। একবার সে পড়েছিল নায়ক চোদ্দতলা বাড়ি থেকে লাফ দিয়ে পড়েছিল একটা চলন্ত দোতলা বাসের উপর। এইভাবেই সে মহাকীর্তি করেছিল অনেকগুলি। জঘন্য! কমিকসের চমৎকার অ্যাডভেঞ্চারের গল্পেও এমন সব অবিশ্বাস্য ঘটনা রয়েছে যে দু-একটা মজাদার ঘটনা ছাড়া অন্য সবই তার কাছে বিরক্তিকর বলে মনে হয়। সেজন্য ও বেছে-বেছে বই পড়ে, কিন্তু ইংরেজি হোক আর বাংলা হোক, খুব কম বই তার পছন্দ হয়। শার্লক হোমসের গল্পগুলি চমৎকার তার বলার গুণে, নানা ঘটনার কথা সেখানে লেখক ভারী চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণনা করেছেন।

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের ব্যাঙ্কে গিয়ে দ্যাখে বেশ হুলুস্থুলু ব্যাপার। কিছুক্ষণ আগে নাকি কর্মীরা অটোমেশনের বিরুদ্ধে কর্মবিরতি পালন করেছেন। ফলে অল্পসময়ে বহু চেক জমা পড়েছে এবং অতিরিক্ত ভিড় হয়েছে। পরদিন শুক্রবার, একদিনই ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে এ সপ্তাহে। শনিবার বড়দিন। তারপর সোমবার তো সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রতীক ধর্মঘট! ব্যাঙ্কের একজন কেরানি জানালেন, ঘন্টাখানেকের আগে হবে বলে মনে হয় না। হতে-হতে একটা-দেড়টা হবে! ভাগ্যিস বিরু প্রহ্লাদকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। বিরু বলল, "চল্ কোথাও ঘুরে আসি।"

ওরা এদিক-ওদিক ঘুরল কয়েক মিনিট। একটা চায়ের দোকানে বসে চা খেল দু'কাপ। বিশ্রী! চা বলেই মনে হল না। দুধের গন্ধও কেমন যেন। ওরা দুজনে এরপর দেখল মেট্রোরেলের কাজ একদিকে চলছে। বড় একটা ক্রেন মাটি খুঁড়ে-খুঁড়ে তুলছে। আবার মাটি আগে যেসব জায়গায় খোঁড়া হয়েছে সে-সব জায়গার উপর লোহা আর সিমেন্ট দিয়ে তৈরি ভারি স্ল্যাব দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। আরও দূরে বড় গর্ত, তার মধ্যে আবার কত নোংরা ফেলেছে মানুষ। ছাইপাঁশ, কাগজের টুকরো, ইঁট-পাটকেল। প্রহ্লাদ বলল, "বিরুদা, এই যে গর্ত করেছে, এর মধ্যে ইঁদুর আছে?"

বিরু বলল, "থাকতেই পারে!"

প্রহ্লাদ বলল, "ইঁদুরদের ভারী মজা না? ওরা ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ নিরাপদে এখান থেকে ওখানে, দমদম থেকে টালিগঞ্জ চলে যেতে পারবে বেড়াতে," বলে হা-হা করে হেসে উঠল।

বিরু বলল, "কলকাতায় যে নতুন করে মশার আক্রমণ শুরু হয়েছে সেটার মূলে এই মাটি খোঁড়াখুঁড়ি আর জল জমা। বিষ-মেশানো কেরোসিন বা পেট্রল নিয়মিত না দিলে হবেই। এই দ্যাখো, দিনের বেলাতেও মশা ভিন্‌ভিন্ করছে।"

প্রহ্লাদ বলল, "একটু আগে তো দেখলাম একজন লোক এক টিন মশার তেল আর দুটো স্প্রে-গান দিয়ে গর্তে ঢুকছিল, তোমাকে বলিনি তখন। ওই যে যখন একটা এরোপ্লেন চলছিল খুব নীচে দিয়ে, তখন তুমি উপরে তাকিয়েছিলে—ওই সময়।"

"তাই নাকি?" বিরু অন্যমনস্ক হয়ে বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, "তা হলে টনক নড়েছে কর্তৃপক্ষের। কোথায় দেখেছিলে বলো তো?"

"ওই তো, ওই যে গর্ত, ওখানে।"

বিরু দেখল গর্তটিকে। তিরিশ-চল্লিশ মিটার দূরে একটা গর্ত। ওপরে একটা লোহার রড থেকে বড় একটা ত্রিপল ঝুলছে।

"লোকটা ওই ত্রিপল ফাঁক করে ঢুকে গেল।"

"বাহ্! ওখানে লোকটা কেন গেল?"

"তা আমি জানব কেমন করে। তবে মনে হয়, মশা মারতেই গেল।"

"মশা। হুঁ, মশা," বিরু বলল, "মশাদের মারাই দরকার।"

"কিন্তু লোকটি আর ফিরে এল না কেন?" প্রহ্লাদ বলল।

"ফিরে আসেনি?"

"না।"

"দুটো স্প্রে-গানই বা কী হবে। লোক তো একটা?"

প্রহ্লাদ বলল, "তা বটে। চলো বিরুদা, ব্যাঙ্কে যাই। বড্ড খিদে পেয়ে যাচ্ছে।"

বিরু বলল, "ব্যাঙ্কে কি খাবারদাবার দিচ্ছে আজকাল?"

প্রহ্লাদ চুপ করে রইল।

বিরু বলল, "চলো না, নীচে নেমে দেখে আসি লোকটা কত মশা মারল? বোধহয় অনেক মশা মারছে। অনেক সময় তো হয়ে গেল।"

প্রহ্লাদ বলল, "নাঃ। বড্ড খিদে পেয়েছে।"

বিরু বলল, "দাঁড়াও, তোমাকে খাওয়াই," বলে পকেট থেকে পাঁচ টাকার একটা নোট বার করে তাকে দিয়ে বলল, "যে দোকানে চা খেয়েছিলাম, সেখানে দেখেছিলাম ঠান্ডা সব জিলিপি রয়েছে, কিন্তু গরম জিলিপি তো এখন পাওয়া যাবে না, তুমি চট করে গোটা-ছয়েক জিলিপি কিনে তিনটে খেয়ে বাকিটা এখানে নিয়ে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করো। আমি দেখি লোকটা মশা মারছে কেমন। একটু উৎসাহ দিয়ে আসি।"

প্রহ্লাদ চলে গেল। কৌতূহলী বিরু তখন এবড়োখেবড়ো ঢালু একটা জায়গা দিয়ে গর্তে নামল, অতি কষ্টে নোংরা বাঁচাতে চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। কাদা, শ্যাওলা এবং অন্য অনেকরকম নোংরাই তার পায়ে তো লেগে গেলই, গায়েও লাগল। সে চলে গেল একেবারে ত্রিপলের কাছাকাছি। দেখল, ত্রিপলের সামনে প্রচুর মাটি নতুন কাটা হয়েছে। যেন পাহাড় জমছে। এই জায়গার মাটি তো কবেই কাটা হয়ে গেছে, নতুন করে কাটা হচ্ছে কেন? সে দেখল, সেখান থেকে উপরে কেবলই আকাশ দেখা যায়। ঠিক সামনের ব্যাঙ্কের বাড়িটাও চোখে পড়ে না।

সে ত্রিপলটা ফাঁক করে মুখ ঢোকাল, কিন্তু হঠাৎ আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। এবার সে একটু ভেতরে ঢুকল। চাপা একটা দমবন্ধ আবহাওয়া সে আশা করেছিল, কিন্তু সে অবাক হয়ে গেল যখন তার গায়ে হাওয়া এসে লাগল। গর্তের মধ্যে হাওয়ার উৎস কী হতে পারে ভাবছে। পাখা চলছে নিশ্চয়, একটু-একটু ঘর্-র্ আওয়াজ আসছে।

তার নাকে এসে লাগল তীব্র একটা গন্ধ। মশার তেলের গন্ধ।

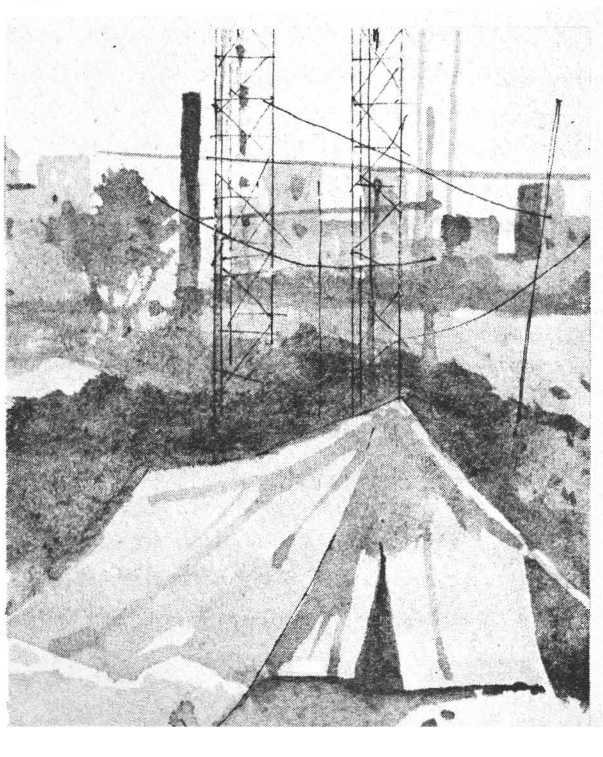

সে বেরিয়ে এল। দেখল একটা বিদ্যুতের তার গেছে। মনে হল সেটা নতুন করে বসানো হয়েছে। ভেতরে একা যাবে কি না সে বুঝতে পারল না। একবার ভাবল যাবে, কিন্তু প্রহ্লাদ এসে তাকে দেখতে না পেয়ে চিন্তিত হবে। কিন্তু এর মধ্যে কী কাজ হচ্ছে ? মেট্রোর কোনও কাজ হবে। কতরকম কাজ হয় এখানে তার সন্ধান কে জানে, কত এঞ্জিনিয়ার কত মাথা খাটিয়ে এই আশ্চর্য জিনিস গড়ে তুলছেন। কলকাতার ওটা গর্ব।

সে আস্তে-আস্তে আবার উপরে উঠে এল। উপরে উঠতেই একজন ষণ্ডামতো লোক তাকে জিজ্ঞেস করল, "ওখানে কী দেখছিলে তুমি, অ্যাঁ ?"

বিরু বলল, "আমি কিছু দেখছিলাম না। আমার এই ব্যাঙ্কের চাকতিটা পড়ে গিয়েছিল কিনা, তাই তুলতে নেমেছিলাম।" সে পকেট থেকে চাকতিটা দেখাল লোকটাকে।

লোকটি বলল, "জায়গাটা খুব বিপজ্জনক। মাঝে-মাঝে কাঁকড়াবিছে বেরোয়, সাপও বেরোও।"

"সাপ ?" বিরু অবাক হয়।

"তাও বেশির ভাগই বিষধর।"

"বাপ্ রে," বিরু বলল। কিন্তু সে ইচ্ছে করেই এই অপরিচিত লোকটিকে বলল না সে কেন নীচে নেমেছিল। লোকটির ভাবভঙ্গি তার একেবারেই পছন্দ হয়নি।

একটু পরই প্রহ্লাদ এল জিলিপি নিয়ে। এসে বলল, "বিরুদা, লাক্ খুব ভাল, আমি যেতেই দেখি নতুন করে জিলিপি ভাজছে। একেবারে গরম বলে চার টাকার নিয়ে এসেছি দশটা ! চমৎকার ! আমাকে একটা ছোট জিলিপি ফাউ দিয়েছে।"

লোকটি ওদের দেখছিল হাঁ করে।

একটু পর ওরা ব্যাঙ্কে গিয়ে পৌঁছল, তখন নম্বর ডাকছে তেষট্টি—বিরিঞ্চি হালদার—তেষট্টি। যাক্, প্রায় সময় হয়ে এল। বিরুর চাকতির নম্বর সাতষট্টি। মিনিট তিন-চার পর টাকা পেয়ে গেল। এবার একটা ভাল টেপ-রেকর্ডার দেখতে হবে। বাড়িতে গিয়ে টাকা রেখে খেয়েদেয়ে দু'জনে মিলে এসপ্ল্যানেডের দিকে যাবে ঠিক করল চারটে নাগাদ। প্রহ্লাদও খুব খুশি। টেপ-রেকর্ডার যদি বিরুদার হয় তা হলে সেও মাঝে-মাঝে শুনতে পারবে।

চারটের সময় মিনিবাসে করে এসপ্ল্যানেডের টিকিট কিনে হল এক মুশকিল। ঠিক লালবাজারের কাছে এক বিরাট ট্র্যাফিক জ্যাম। কতকগুলি শোভাযাত্রা একটু আগে ওদিক দিয়ে গিয়ে এমন জ্যাম-জট পাকিয়েছে যে, এখন এসপ্ল্যানেড যেতে লেগে যাবে আরও অন্তত আধঘণ্টা ! তাই ওরা দু'জনে মিলে নেমে পড়ল।

আর ঠিক সেই সময় তাদের কাছে, অতি ধীরগতিতে একটা জিপ আসছিল, সেটা থেমে গেল। "কোথায় যাচ্ছ বিরু ?" জিপ থেকে প্রশ্ন করলেন অখিলেশবাবু।

বিরু বলল, "যাচ্ছিলাম এসপ্ল্যানেডে, কিন্তু এই জ্যামে পড়ে মিনিবাস ছেড়ে দিয়েছি।"

"উঠে এসো জিপে," অখিলেশবাবু বললেন। অবশ্য পুলিশ-জিপেরও সাধ্য নেই এই ভিড় কেটে বেরিয়ে যাওয়ার। সামনে প্রায় দু-তিনশো গাড়ি থেমে আছে। তিনি বললেন, "এসপ্ল্যানেডে যাচ্ছ কেন ?"

বিরু ব্যাপারটা বলল জিপে উঠতে উঠতে। প্রহ্লাদও খুব খুশি। একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে পুলিশ-জিপে ওঠার ভাগ্য তার এই প্রথম।

অখিলেশবাবুর সঙ্গে অন্য এক অফিসার ছিলেন। ওঁরা নিজেদের মধ্যে 'বড়দা' নামক কোনও এক ব্যক্তির কীর্তি-কাহিনী নিয়ে আলোচনা করছিলেন। বড়দা নামক অপরাধীটি দিল্লির তিনটে ব্যাঙ্কে ডাকাতি করে প্রায় চল্লিশ লাখ টাকা লুঠ করেছে। লোকটি অসাধারণ চতুর, পুলিশের চোখে সে বহুবার ধুলো নিক্ষেপ করেছে। 'নিক্ষেপ' শব্দটি অখিলেশবাবুর সঙ্গী দু'বার ব্যবহার করেছেন। লোকটি নাকি এখন কলকাতায়। কয়েক দিন আগে দিল্লি-পুলিশ কলকাতার পুলিশকে সতর্ক করে দিয়েছে যে, সে কলকাতায় আছে বলে তাদের কাছে খবর আছে। বড়দাকে খোঁজার একটা দায়িত্ব এসে পড়েছে, কিন্তু নানারকম খোঁজ করেও পুলিশ কিছু করতে পারেনি।

এইসব কথা শুনে বিরু আর প্রহ্লাদ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে লাগল। নীরবে শুনতে লাগল তারা বড়দার কীর্তি-কাহিনী !

প্রায় ছ-সাত মিনিট কেটে গেল। বিরু কী যেন ভাবছিল, ব্যাঙ্ক··· বড়দার রোমাঞ্চকর কাহিনী। মনে পড়ল সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ব্যাঙ্ক-ভল্টে যাওয়ার এক প্রায় অবিশ্বাস্য সত্য কাহিনী, যেটা রোমে ঘটেছিল। শহরের তলা দিয়ে বয়ে যাওয়া বিরাট এক নর্দমার ভেতর ঢুকে, সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ব্যাঙ্ক লুঠ করেছিল কয়েকজন ডাকাত। আচ্ছা, এটাও তো হতে পারে ! হ্যাঁ, হতেই পারে ! উত্তেজনা তার বাড়ল যখন তার মনে পড়ল সেই চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের ত্রিপল যেখানে ছিল তার সামনেই সেই ব্যাঙ্ক যে ব্যাঙ্কে তারা আজই গিয়েছিল। সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠে বলল, "বুঝলেন ! বুঝলেন ! আমি, আমি···"

অখিলেশবাবু বললেন, "কী হল তোমার, অ্যাঁ ?"

বিরু বলল, "হতে পারে, হতে পারে ! হতেই পারে···পরশু তো বড়দিন, তার পরদিন তো রবিবার, তার পরদিন আবার সারা ভারত ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ! ঠিক ধরেছি ! সুড়ঙ্গ···ভাগ্যিস আপনার সঙ্গে দেখা হল হঠাৎ, নইলে মনেই হত না।"

প্রহ্লাদের মনে হল বিরুদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে হঠাৎ !

বিরু বলল, "আমার কথা বিশ্বাস করবেন ?" উত্তেজনায় সে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, "বিশ্বাস করুন···আমি···আমি···আমি···আর কিছু হতে পারে না। আমি বুঝতে পেরেছি। আমার কথায় একটু যদি কান দেন···তা হলে···।"

॥ সাত ॥

রাত ঠিক বারোটা। চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের চেহারা তখন একেবারে অন্যরকম। দিনের সেই কলকোলাহল আর নেই। তিনটি পুলিশের কালো গাড়ি ব্যাঙ্কের সামনে এসে থামল। ধপ্-ধপ্ করে লাফিয়ে পড়ল প্রায় চল্লিশজন সশস্ত্র কনস্টেবল। সামনের জিপ থেকে নামলেন চারজন অফিসার। ঘিরে ফেলা হল প্রায় নিঃশব্দে পাতাল রেলের গর্ত। বিরাট সার্চলাইট ফেলে দেখা গেল ত্রিপল তখনও রয়েছে ! পুলিশ সেখানে গিয়ে হুঙ্কার দিল—"কে আছ এর মধ্যে ?" কোনও উত্তর নেই। পুলিশ তখন দশ-বারোবার ফাঁকা আওয়াজ করল। উত্তেজিতভাবে বিরু এবং প্রহ্লাদ

অনেকটা দূর থেকে এই বিরাট ব্যাপারটা দেখছে। বিরুর মাঝে-মাঝে মনে হচ্ছে, যদি না হয় ? আবার মনে-মনেই বলছে, হতেই হবে। জায়গাটা ব্যাঙ্কের সামনে। নতুন কাটা মাটি··· বিদ্যুতে সংযোগ··· মশার তেল··· তার উপর 'বড়দা'··· এখন কলকাতায় ! হতে হবে, হতেই হবে !

সবসমেত দশজন ধরা পড়ল সেই সুড়ঙ্গ থেকে। ওরা ব্যাঙ্কের তলায় পৌঁছে গিয়েছিল। এখন আর দরকার ছিল চার-পাঁচ ঘণ্টার কাজ। তারপর সময় বুঝে একটা বিস্ফোরণ। কয়লাখনিতে যেমন জিলেগনাইট ব্যবহার করা হয় বিস্ফোরণের জন্য সেরকম জিলেগনাইট পাওয়া গেল ছ'টা। আর পাওয়া গেল দূর থেকে জিলেগনাইট ফাটানোর যন্ত্র। দশজনের মধ্যে পাওয়া গেল শ্যামলকে, তারপর সুন্দরবনের রঘুবীর সর্দারকে। পাওয়া গেল সিউড়ির হিরু হোসেনকে। আরও তিনজনকে পাওয়া গেল। তাদের একজন রানাঘাটের, একজন মেদিনীপুরের আর বাকিজন রাঁচির। প্রত্যেকেই সবল এবং সমর্থ। বাকি চারজন বড়দার দলের। বড়দাকে ওই দলে পাওয়া গেল না।

এর পরের ঘটনাবলী বিশদ করে বলতে গেলে লেগে যাবে অনেকখানি জায়গা। কেমন করে কলকাতারই একটা বিরাট হোটেলের ঘর থেকে একজন মাদ্রাজি ভদ্রলোক ধরা পড়লেন, যাঁর নাম খাতায় ছিল কৃষ্ণমূর্তি, আসলে যিনি কমল বর্মা। ওটাও ওঁর আসল নাম কি না কে জানে ? ইনিই বড়দা নামে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে এবং পরে পুলিশের কাছে পরিচিত। কেবল পাওয়া গেল না দীপককে। শ্যামল বলল, সে দীপককে কখনওই দ্যাখেনি। অবশেষে দীপককেও পাওয়া গেল শ্যামবাজারের একটা কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের দোতলা থেকে। অনাহারে এবং ঘুমের ওষুধের ক্লান্তিতে মৃতপ্রায় অবস্থায়। ওই স্কুলটি হাইকোর্টের নির্দেশে কয়েক মাস হল বন্ধ ছিল, বাড়িওলার সঙ্গে স্কুল-কর্তৃপক্ষের কী নিয়ে যেন বিবাদের ফলে ওই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ! অনাহারে ধৃত ব্যক্তিদের একজন পুলিশের জেরার ঠেলায় বলে দিতে বাধ্য হল। খবরের কাগজে ছবি ছাপা হল। বিরুদের বহু জায়গা থেকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। পুলিশ থেকে বিরুকে পুরস্কার দেওয়া হল চারহাজার টাকা। কিছু প্রশংসা পেল প্রহ্লাদও। তাতে তার আহ্লাদ আর ধরে না ! পুরস্কারের টাকাও কিছু তার ভাগে জুটল। শ্যামল, হিরু বাড়ি ফিরে গেল, রঘুবীর চলে গেল সুন্দরবনে। আর দীপক গেল তার বাড়িতে।

এরপর কলকাতায় এই নিয়ে তুমুল আলোচনা শুরু হল। টিভি-কর্তৃপক্ষ ডেকে পাঠালেন বিরু, দীপক, প্রহ্লাদ এবং আরও সংশ্লিষ্ট দু-একজনকে। ইন্টারভিউ 'লাইভ' হল বলে নিজেরা নিজেদের আর দেখতে পেল না বেচারারা ! বিরুকে একজন প্রশ্ন করলেন, "এই যে বড়দা ধরা পড়ল তাতে তোমার কৃতিত্বে আমরা, যুবকেরা গর্বিত। তুমি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে বসে ছিলে যখন, তখন খেয়াল যদি না করতে তা হলে এ ব্যাপারটাই তো তোমার মাথায় আসত না, না ?"

বিরু বলল, "আমার চাইতেও বেশি কৃতিত্ব অখিলেশবাবুর। তিনি যদি লালবাজারের কাছে জিপে আমাদের তুলে না নিতেন তা হলে বড়দার কলকাতায় থাকার কথা এবং ব্যাংক ডাকাতির কথাও জানতে পারতাম না, আর ব্যাপারটা হয়তো মনেই পড়ত না ! এবং আমার বন্ধু দীপক আর শ্যামলকেও আমরা হয়তো পেতাম না।"

দীপক বলল, "এই ব্যাপারে সবচেয়ে বড় সাহসের কাজ দেখিয়েছে অবশ্যই শ্যামল। সে বুদ্ধি করে একটা চিঠি লিখে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে একজন লোককে দিয়ে ঠিক খবর পাঠিয়েছিল। অবশ্য তাতে খুব কাজ হয়নি। কিন্তু ছেলেধরারা যে সক্রিয় এটা অন্তত জানা গিয়েছিল। ওই সব দুর্বৃত্তরা যে মাটি খুঁড়বার জন্য লোক সংগ্রহ করছিল সেটা অবশ্য কেউই বুঝতে পারেনি। আমিও না। আমি অবশ্য অসুস্থ হয়েই ছিলাম। আমাকে ওরা ঠিকই খেতে দিত। আমাকে দিয়ে কাজ হবে না এটা জেনে তারা কেবল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল মনে হয়। ঘুমের ওষুধ নিয়মিত খাওয়াত। আর একজন লোক পাহারা দিত ঘরের বাইরে। চিৎকার করলেই আমাকে মেরে ফেলার ভয় দেখাত।"

শ্যামল লজ্জায় বিশেষ কিছু বলতে পারল না। সে বলল, তার হঠাৎ মনে হল তাই সে চিঠি লিখে দিয়েছিল, আর একটি লোককে কাছে পেয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিল ! একটা হাত ধরা থাকায় দারুণ অসুবিধে হচ্ছিল, ভয়ও করছিল !

টিভি প্রোগ্রাম দেখছিল সংবাদপত্রের এক জুনিয়র রিপোর্টার। সে মনে-মনে বলল, 'আমি যে এত পরিশ্রম করে রিপোর্টগুলো লিখলাম, যার ফলে প্রেস-মালিক এলেন, খবর দিলেন, সিউড়ি থেকে এলেন হিরুর বাবা, সুন্দরবন থেকে এলেন রঘুবীর সর্দারের বাবা—এ-সব কথা কেউ বলবে না। সাংবাদিকদের এই এক দুর্ভাগ্য !'

এদিকে পুলিশের বড়কর্তা টিভি প্রোগ্রাম দেখে মনে-মনে ভাবলেন, এটা অন্যায়, এত বড় একটা ক্রিমিনালকে ধরা কি সোজা কথা। দিল্লির পুলিশ যা পারেনি, তা কলকাতার পুলিশ পেরেছে, এটা নিয়ে কেউ কিছুই বলল না ?

টিভি দেখছিলেন বিরুর জ্যাঠামশাই। তিনি সবটা দেখে বললেন, "হুঁ, আমি যে বিরুকে দেড়হাজার টাকার চেক দিয়ে ব্যাঙ্কে পাঠালাম, সেটা বুঝি কিছু নয় ? ব্যাঙ্কে গেল বলেই তো ও ব্যাপারটা দেখল এবং বুঝতে পারল ! টেপ-রেকর্ডার দেখার জন্যই সে যখন এসপ্ল্যানেডে যাচ্ছিল, তখনই তো অখিলেশবাবুর সঙ্গে ওদের দেখা··· । এ দুটো ব্যাপারেই কৃতিত্ব তো আমারই··· ।"

চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের ওই ব্যাঙ্কের একজন কেরানিও ওই প্রোগ্রাম দেখে বললেন, "আর আমরা যে কর্মবিরতি করলাম সেটা বুঝি কিছু নয় ? সেই জন্যই তো ও বাইরে বেরিয়ে গেল, আর ব্যাপারটা ওর নজরে পড়ল। ঝটপট টাকা দিয়ে দিলে তো সর্বনাশ হয়ে যেত, কেবল ওদেরই নয়, ব্যাঙ্কেরও, সে-কথা কেউ বোঝে ?"

ছবি : অনুপ রায়

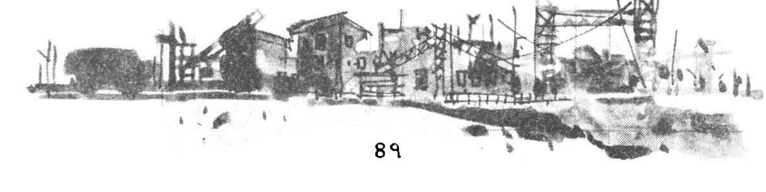

Response 1005

ছবি এঁকেছে **সন্দীপ্ত দাশ** (বয়স ৫)

ছবি এঁকেছে **মনমিতা দত্ত** (বয়স ১০)

পাঁচ পয়সায় স্বর্গ

একটা ছোট্ট বাড়িতে বাস করত এক কৃপণ লোক। সে-বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ থাকত না। তার চাকরি মোটামুটি ভালই, তবুও তার ঘরে লোক এলে সে তাদের গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলত। ঘরে আনলে চা-টা দিতে হবে বলে ঘরে আনত না।

একদিন সে অফিসে আসার পথে শুনল, একজন তাকে দেখিয়ে আর একজনকে বলছে, "ওই লোকটা প্রচণ্ড কৃপণ, মৃত্যুর পরে ও ঠিক নরকে যাবে।"

লোকটা তাই শুনে রীতিমত ঘাবড়ে গেল। তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। সেদিন তার অফিসে যাওয়া হল না।

অফিস থেকে সে কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিল। দুশ্চিন্তায় সে খেতেই ভুলে গেল। তারপর না খেয়ে খেয়ে যখন মরতে বসেছে, তখন এক ভিখারিকে পাঁচটি পয়সা ভিক্ষা দিল। কিন্তু পরের দিনই সে মারা গেল।

মৃত্যুর পরে তার আত্মা হুশ করে ওপরে উঠে বিরাট এক রাজবাড়িতে এসে হাজির। সেখানে যমরাজ ছিলেন। লোকটা তাকে দেখে বলল, "আমি কি স্বর্গে এসেছি?"

যমরাজ বললেন, "কিপটেমি করে জীবন কাটালে, আর এখন স্বর্গে বাস করতে চাও? তুমি নরকে এসেছ। তোমার স্থান এখানেই।"

লোকটা অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু আমি যে এক ভিখারিকে পাঁচটি পয়সা দান করে এসেছি।"

যমরাজ বললেন, "পাঁচ পয়সা দান করেই স্বর্গবাসের আশা করে বসে আছ? তুমি তো ভারী বোকা।"

লোকটা তখন বলল, "তবে আমাকে আমার পাঁচ পয়সা এখনই ফেরত দিয়ে দিন।"

শুনে যমরাজ থ।

অরুণাভ ঘোষরায় (বয়স ১০)

কাকেদের ধর্মঘট

বিছানায় শুয়ে শুয়ে হঠাৎ শুনলাম, কাকেরা বলাবলি করছে, তারা আজ ধর্মঘট করবে। মাকে সে-কথা বলতেই মা হেসে উঠলেন।

রোজ ভোরবেলা কাকের ডাকে আমার ঘুম ভেঙে যায়, কিন্তু আজ কেউ ডাকল না।

আমাদের টিভির অ্যান্টেনায় অনেক কাক বসে। আজ সেখানে একটাও কাক নেই। কাকেরা নিশ্চয়ই ধর্মঘট করেছে। কিন্তু কেন?

আমার মনে হয়, মানুষদের ধর্মঘট দেখে দেখে ওদেরও ধর্মঘট করতে ইচ্ছে হয়েছে।

জয়দীপ ঘোষাল (বয়স ৭)

তুতু ফেরেনি

আজ প্রায় সাতদিন হয়ে গেল, কিন্তু আমাদের ময়নাপাখি 'তুতু' আজও তার খাঁচায় ফিরে এল না।

একটা কথা আমি কাউকে বলতে পারছি না। কথাটা হল, তুতুকে আমিই চারদিনের ছুটি দিয়েছিলাম ওর বাড়ি যাবার জন্য।

বেশ কিছুদিন আগে বাবা তুতুকে পাখির দোকান থেকে কিনে এনেছিলেন। ও অনেক কথা শিখেছিল, কিন্তু মাঝে-মাঝে চুপ করে তাকিয়ে থাকত খোলা আকাশের দিকে। তখন ওর জন্যে আমার খুব কষ্ট হত। মনে হত, ও যেন ফেলে-আসা পাহাড়, জঙ্গল, আকাশ আর ওর মা-বাবার কথা ভাবছে।

একদিন দেখলাম সবিতাদিদি মায়ের কাছ থেকে চারদিনের ছুটি নিয়ে তাঁর বাড়ি গেলেন। তাই দেখে আমি তুতুর খাঁচার দরজা খুলে দিয়ে বললাম, "যাও, দিদির মতো তুমিও বরং চারদিনের জন্যে মা-বাবার কাছ থেকে ঘুরে এসো।"

খাঁচার খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে ও আলসের উপর চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর ডানা মেলে উড়ে গেল আকাশে।

কিন্তু ও ফিরে এল না কেন? ও কি আমাদের ভুলে গেছে! নাকি এ-বাড়ির রাস্তা চিনতে পারছে না!

অম্লানজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৮)

বিপিনবাবু আর নমকসেবক

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

কে যেন গম্ভীর স্বরে বলল, "শো জাইয়ে ।" তিন যমদূত তাঁকে শুইয়ে দিল, একজন ব্লাডপ্রেশার মাপার যন্ত্র দিয়ে তাঁর রক্তচাপ মাপতে লাগল । আর-একজন গম্ভীর স্বরে বলল, "ইনকো নমক খিলাও ।" দুই যমদূত জোর করে তাঁর মুখে নুন গুঁজে দিতে লাগল ।

ঠক্-ঠক্-ঠক্ করে দরজায় শব্দ হতেই বিপিনবাবুর স্বপ্ন ভেঙে গেল । "চায় লায়া ।" ঠক্-ঠক্-ঠক্ । বিপিনবাবু উঠে পড়লেন । ঘুম-চোখে উঠে এসে দরজা খুলে দিলেন । গরম চা খেয়ে একটু ধাতস্থ হলেন ।

ভোর রাতে তিনি কী বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখলেন । হাতমুখ ধুয়ে মাথায় বাঁদুরে টুপি চাপিয়ে তিনি বেড়াতে বেরোলেন ।

পুজোর ছুটিতে বিপিনবাবু কয়েকদিনের জন্যে মাইথন বেড়াতে এসেছেন । একাই । একা আসার একটু ইতিহাস আছে । পুজোর মধ্যে একটু ভাল-মন্দ খাওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই মুরগি কিনে এনে গিন্নিকে বলেছিলেন, "রাঁধো তো বেশ জম্পেশ করে ।" রান্না মুখে দিয়ে রাগে তাঁর সর্বাঙ্গ জ্বলে যায় । চিৎকার করে বলেছিলেন, "এটা কী হয়েছে ?"

বিপিন-জায়া অবাক হয়ে বলেছিলেন, "কী হল ?"

বিপিন আরও চিৎকার করে বলে ওঠেন, "এত নুন দিয়েছ কেন ? এটা কি চিকেন-কারি হয়েছে ?"

বিপিনবাবুর পত্নী ঠোঁট উলটে বলেছিলেন, "তুমি রান্নার ছাই বোঝো !"

তাই নিয়ে কথা-কাটাকাটি । রাগ করে বিপিনবাবু উঠে পড়েন । বিপিন-জায়া চিৎকার করে বলেন, "যেখানে ভাল রান্না পাবে, সেখানে যাও ।"

"যাবই তো," বলে বিপিনবাবু বেরিয়ে পড়েন ।

একে ওকে তাকে ধরে মাইথনে ডি· ভি· সি·-র বাংলোয় সাত দিন থাকার বন্দোবস্ত করে একাই চলে এসেছিলেন ।

মাইথন তাঁর খুব ভাল লেগেছে । নির্জন, শান্ত । কলকাতার কালীপুজোর শব্দ আর আলোর অত্যাচার থেকে বেঁচেছেন । দু'বেলা খাওয়া-দাওয়া করেন, আর মাইথন ড্যামের ধার দিয়ে আপনমনে ঘুরে বেড়ান ।

কিন্তু বিপিনবাবুর কপালে এত সুখ সইল না ।

প্রথম দু'দিন খেয়াল করেননি । তৃতীয় দিন ডিনার খেতে গিয়ে তাঁর মনে হল, চিকেন-কারিটা ঠিক রান্না হয়নি । দু'টুকরো খাওয়ার পরেই টের পেলেন, নুন খুব বেশি হয়েছে ।

যে-বেয়ারা পরিবেশন করছিল, তাকে ডেকে হিন্দিতে বললেন (বিপিনবাবুর হিন্দি-জ্ঞান নড়বড়ে), "চিকেন-কারিমে নমক বেশি হো গিয়া । ইসকা অর্ধেক দেনেসে ঠিক হোতা ।" বেয়ারা বলল, "হাঁ, হুজুর, বাবুর্চিকো বোল দুঙ্গা ।"

পরদিন রাতে খেতে বসে একই ব্যাপার । দিনের খাওয়ায় কোনও গোলমাল নেই । বিপিনবাবু বুঝলেন, রাতের

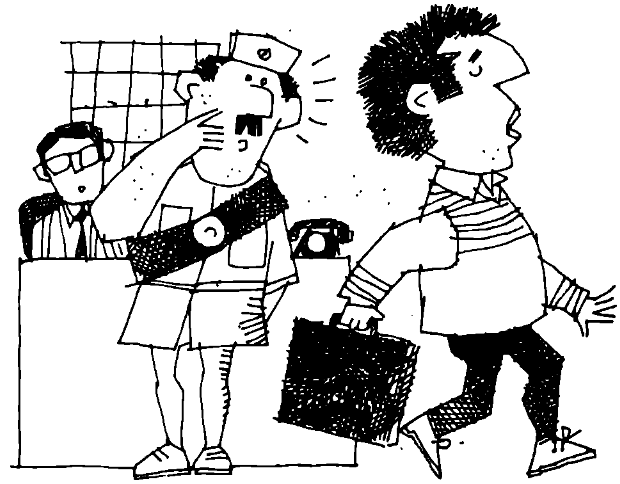

বাবুর্চিটাই যত নষ্টের মূল । গম্ভীর স্বরে বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "এইঠো কেয়া বানায়া ?"

বেয়ারা বলল, "সাব, ইয়ে তো চিকিন-বিরিয়ানি ।"

বিপিনবাবু তাকে থামিয়ে দিলেন, "সে হাম জানতা হ্যায় । চিকেন-বিরিয়ানি হাম্ বহুত বার খায়া । লেকিন এইঠো কেয়া বনায়া ? নুনমেঁ ভরিয়ে ফেলা হুয়া ।"

বেয়ারা গম্ভীর হয়ে বলল, "ঔর কোই শিকায়ত ।"

বিপিনবাবু বললেন, "একটাই বাত । নমক বেশি ।"

পঞ্চম দিন রাতে খেতে বসে বিপিনবাবু টের পেলেন ডালে নুন, লোউকিতে নুন, বাইগনভাজিতে নুন, চিকেনে নুন । নুনের চোটে তাঁর ব্রহ্মরন্ধ্র জ্বলে গেল । রাগে আটখানা হয়ে তিনি বেয়ারাকে ডেকে বললেন, "রাতকা খানা কৌন বানিয়েছে ? বাবুর্চিকো নাম কেয়া হ্যায় ? বোলাও উসকো ।"

বেয়ারা শশব্যস্ত হয়ে বলল, "সাব, বাবুর্চিকো নাম রামসেবক । উহ্ তো খানা বনানেকে বাদ ঘর চলা গ্যয়া । কল্ ভেজ দুঙ্গা ।"

বিপিনবাবু ঢক-ঢক করে জল খেয়ে চলে এলেন । ওই বাবুর্চি আর আসে না, দেখাও করে না । বিপিনবাবু যতবার বলেন, তাকে ডাকো, ততবার বেয়ারা বলে, "আপকা পাশ ভেজ দুঙ্গা ।" সে আর কিছুতেই সামনে আসে না ।

এই করে করে বিপিনবাবুর দশ দিনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল । মাইথনের সব ভাল । নীল আকাশ, শান্ত সকাল আর সন্ধ্যা, নির্জন প্রকৃতি, পাখির দল, বাঁধের উঁচু পাড়, কল্যাণেশ্বরী মন্দির, বজরঙ্গবলীর মন্দির—সবই তাঁর ভাল লেগেছে । কেবল রাতের বাবুর্চির ওই দরাজ হাতে নুন ঢালা !

কোলফিল্ড এক্সপ্রেসে বিপিনবাবু কলকাতা ফিরবেন । একটু ব্যস্ত লোক বলে বিকেল চারটের মধ্যেই একটা অটো-রিকশা ডেকে তাতে চড়ে বসলেন । বিদায়বেলায় বেয়ারার দল সার দিয়ে এসে দাঁড়াল । কোনও কথা না বলে বিপিনবাবু একটি দশ টাকার নোট তাঁর পরিচিত বেয়ারার প্রসারিত হাতে তুলে দিলেন । সে আর-একজনকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "সাব, ইয়ে হ্যায় রামসেবক বাবুর্চি ।"

বিপিনবাবু কটমট করে একবার তার দিকে তাকালেন । তারপর খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, "তুমারা নাম রামসেবক নেই, নমকসেবক ।"

বলে অটো-চালককে বললেন, "জলদি চলো ।"

ছবি : দেবাশিস দেব

ডোরাকাটা জামা

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : লজেন্স কিনতে গিয়ে হরেনদার দোকানে নিতুকে দেখল রুকু। নিতুর গায়ে ডোরাকাটা নীল জামা। সুকু ওদিকে অনিলের নাক ফাটিয়েছে, সেইসঙ্গে জানিয়েছে, "পলাশের মাথা ফাটাব।" স্কুলের অনুষ্ঠানে পলাশ অন্ধকারে সিটি দেয়, অথচ দোষ চাপায় নিতুর ঘাড়ে। সুকু উঠে পলাশকে ঘুসি মেরে শুইয়ে দেয়। পলাশের বাবা রেগে আগুন। পুলিশ এসে হাতকড়া লাগায়। তারপর···

গোটা শহরে ভীষণ উত্তেজনা। সবাই বলছে, "টেরিফিক ব্যাপার মশাই। বড়লোক কি এমনিতে হয়। দু'নম্বরি রাস্তা ধরতে হয়। বাড়ির পর বাড়ি, গাড়ির পর গাড়ি। ছাদে সুইমিং পুল। রোজ রাতে হাজার বাতি জ্বেলে পার্টি। তলে-তলে কত ব্যাপার ছিল একবার দেখেছেন মশাই।"

হাটে, বাজারে, চায়ের দোকানে, সেলুনে, সারাদিন মুখে-মুখে এই এক কথা। শহরের একমাত্র দৈনিক, নর্দার্ন পোস্টের প্রথম পাতাতেই ফলাও খবর :

'ব্যবসায়ী গ্রেফতার। পরিত্যক্ত অভ্রখনি থেকে হাজার হাজার টাকার চোরাই মাল উদ্ধার। গত বছর লাড়লো হাউসে মধ্য রাতে যে ভয়ঙ্কর ডাকাতি হয়েছিল সেই লুটের মালেরও বেশকিছু অংশ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই অপরাধের অন্যান্য অপরাধীদের ধরবার জন্যে পুলিশ বিশাল জাল পেতেছে।'

পলাশের বাবার ছবি দিয়েছে। ছবি তোলার সময় ভদ্রলোক মুখ ঢাকার চেষ্টা করেছিলেন। পুরোটা ঢাকতে পারেননি। পাশ থেকে মুখের আধখানা দেখা যাচ্ছে। খবরে সুকুর নাম আছে। বিখ্যাত ডিস্ট্রিক্ট সার্জেন ডক্টর প্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ছোট ছেলে সুকু পরোক্ষভাবে অপরাধীকে ধরার ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করেছে। এর জন্যে জেলাশাসক তাকে একটি চিড়িয়াখানা উপহার দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অনেকেই হয়তো আশ্চর্য হবেন, একজন কিশোরকে একটি চিড়িয়াখানা কীভাবে উপহার দেওয়া যায়। শহরের প্রান্তে প্রখ্যাত ধনী ব্যারন মল্লিক একটি ব্যক্তিগত চিড়িয়াখানা স্থাপন করেছিলেন। গত বছর আথেন্স বিমান দুর্ঘটনায় তিনি মারা যাবার পর চিড়িয়াখানাটি অবহেলিত অবস্থায় ক্রমঃধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছিল। একজোড়া বাঘ ছিল, মারা গেছে তিন মাস আগে। সুকু মাসখানেক আগে জেলাশাসককে চিঠি লিখে চিড়িয়াখানাটিকে কীভাবে বাঁচানো যায়, তার প্ল্যান দিয়েছিল। জেলাশাসক সেই চিঠিতে খুশি হয়েছিলেন, এখন এই সিদ্ধান্ত। সুকুর সঙ্গে বন্যপ্রাণীদের অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা সর্বজনবিদিত। সাহসী এই ছেলেটি একবার একটি ময়াল সাপ জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে দীর্ঘকাল নিজের বাড়িতে রেখেছিল। ইতিমধ্যেই সে একটি ছোটখাটো চিড়িয়াখানা করে ফেলেছে। কিশোরটির হাতে 'ব্যারন জু'-এর ভার তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই। যোগ্যতার বিচারে বয়স কোনও বাধা হতে পারে না।

সুকুর বাবা কাগজটা সামনের টেবিলে ফেলে দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন গুম্ মেরে। রুকু আর সুকু ভয়ে-ভয়ে তাকিয়ে আছে বাবার মুখের দিকে। সকালের টোস্ট খাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। আধ-কামড় মুখে নিয়ে চিবোতে আর সাহস হচ্ছে না। কড়ড়-মড়ড় শব্দ হবে এক্ষুনি।

ডাক্তার প্রসন্ন বললেন, "এটা কী ধরনের সিদ্ধান্ত হল। পুরস্কার না তিরস্কার ! এইটুকু একটা ছেলের ঘাড়ে অত বড় একটা চিড়িয়াখানা ! সামলাবে কী করে !"

সুকুর মা বললেন, "নামেই চিড়িয়াখানা। বিশেষ কিছুই নেই। থাকার মধ্যে ডজনখানেক পাখি আর বাঁদর আছে।"

"তার মানে তুমি বলছ, এ হল বামুনকে গোরু দান। পুষতে-পুষতে দুধ পাবার আগেই দেউলে। সুকুর পড়াশোনা তা হলে মাথায় উঠল।"

"তা কেন ? ও ছেলে সব পারে।"

"সব পারলেও এটা পারবে না। চিড়িয়াখানা কি মুখের কথা ! টাকার খেলা। বাঘ চাই, সিংহ চাই, ভাল্লুক চাই। মিউজিয়াম হলে কথা ছিল না। আমি জেলাশাসককে একটা চিঠি লিখে বিনীতভাবে জানাব, আপনি দয়া করে এই পুরস্কার ফিরিয়ে নিন।"

সুকু হৈ-হৈ করে উঠল, "না বাবা, না বাবা। আমি সত্যিকারের চিড়িয়াখানাই করব। চিড়িয়া মানে পাখি। আমি নানা জাতের পাখি পুষব।"

সুকুর কথা শেষ হবার আগেই দরজার ঘণ্টা নড়ে উঠল। কাজের মেয়ে সুখিয়া এসে বললে, "এক বাবু ডাকছেন।"

স্টেশনারি দোকানের মালিক হরেনবাবু এলেন। সুকুর হরেনদা। গম্ভীর মুখ। চেয়ার টেনে বসলেন। বসেই বললেন, "অসম্ভব খিদে পেয়েছে। আমি একটা টোস্ট খাচ্ছি।"

ডাক্তারবাবু হেসে বললেন, "একটা কেন ? আপনি এক ডজন খান। একটা ডিমসেদ্ধ তুলে নিন প্লেটে। পটে চা আছে ঢেলে নিন।"

"আপনার বাড়ির চা অসহ্য ভাল। খেলে মন কেমন করে। দুঃখ হয়।"

"অ্যাঁ, দুঃখ হয় ! সে আবার কী ?"

রুকু হেসে ফেলেছে। সুকু বললে, "হরেনদা, অসহ্য ভাল না অসম্ভব ভাল !"

"অসম্ভব ভাল শব্দটা আমি জানি মাস্টার। কোনও নতুনত্ব নেই। যে ভাল সহ্য করা যায় না, তাকেই বলে অসহ্য ভাল। এইরকম নতুন-নতুন কথা, তুমি আমার কাছে অনেক পাবে ভাই। লোকে কি আমায় সাধে ভালবাসে ! ভালবাসে আমার অসম্ভব গুণের জন্যে।"

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "গুণ আবার অসম্ভব হয় কী করে !"

"আজ্ঞে হয়। অসম্ভব গরম যদি হয়, অসম্ভব গুণ হবে না কেন ?"

"বেশ হোক। তা মন-কেমন-করা চা জিনিসটা কী রকম ?"

"আজ্ঞে, এই চা খেলে নিজের বাড়ির চায়ের কথা মনে পড়ে যায়, আর ভীষণ মন খারাপ হয়ে যায়। এ কী রে বাবা ! এর মানে চা ! যেন গামছা নিঙড়নো জল !"

দরজার ঘণ্টা বেজে উঠল।

ডাক্তার মুখার্জি বললেন, "আবার কে ?"

দুধের মতো সাদা প্যান্ট-জামা পরে কমল ভৌমিক এসে ঢুকলেন। হাসি-হাসি মুখ। পেছনে ওলটানো পরিপাটি চুল। হরেনদার মুখে ডিম আর টোস্ট। ভারী গলায় বলে উঠলেন, "কী সুন্দর চেহারা আপনার। যেন জলতরঙ্গ। একেবারে খলবল করছে।"

কমল ভৌমিক বললেন, "আপনারই বা মন্দ কিসের !"

"না ভাই, আমার মেদ এসে গেছে। ফ্যাট জমে গেছে।"

"তা তো জমবেই, যেভাবে খাচ্ছেন।"

"কী করব বলুন ! আমার একটাই রোগ। থেকে-থেকে ভীষণ খিদে পায়।"

কমল ভৌমিক ডক্টর মুখার্জিকে নমস্কার করে চেয়ার টেনে বসলেন। সুকু আর রুকু অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে মানুষটির দিকে। যেমন লম্বা, তেমন চেহারা, তেমন সুন্দর দেখতে।

সুকুর মা জিজ্ঞেস করলেন, "কী খাবেন বলুন ?"

হাসি-হাসি মুখে কমল বললেন, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। আমি আবার ঘড়িধরা সময়ে খাই।"

হরেনদা বললেন, "হঠাৎ খিদে পেলে কী করেন ?"

"পায় না। আমার ঘড়ি হল খিদে। ভোরের দিকে যেই খিদে পেল, অমনি বুঝলাম, সাতটা বেজেছে। ঘড়ি দেখুন। একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় সাতটা। সাতটা, বারোটা, চারটে, আটটা। একেবারে বিলিতি ঘড়ি। স্লো-ফাস্ট হবার উপায় নেই।"

হরেনদা আর-একটা টোস্টের দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে বললেন, "কী করে এমন দুর্ঘটনা হল !"

"দুর্ঘটনা ?" কমল ভৌমিক অবাক হলেন।

"ওই যে পেটটা ঘড়ি হয়ে গেল।"

কমল ভৌমিক হাসতে-হাসতে বললেন, "হয়, হয়। সাধনার জোরে হয়। জীবন হল সাধনা। যতই সাধবেন, ততই সুর বেরোবে।"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "সকাল সাতটার সময় কী খান আপনি ?"

"সামান্য। আধসেরটাক ছোলা আর বাদাম ভেজানো। নুন আর আদাকুচি দিয়ে। তার আগে শ-পাঁচেক ডন আর হাজারখানেক বৈঠক মেরে নি।"

হরেনদা আঁক করে একটা শব্দ করলেন, "আহা রে, কী কষ্ট !"

কমল ভৌমিক বললেন, "এইবার একটা এ-কার যোগ করুন, কষ্ট না করলে কেষ্ট কি মেলে !"

"একটা এ-কারের জন্যে অত কষ্ট পোষায় না।"

কমল ভৌমিক মৃদু হেসে বললেন, "একেই বলে মানুষের বিকার। খাবেন অথচ হজমের চেষ্টা করবেন না !"

ডক্টর মুখার্জি বললেন, "তা বারোটার সময় কী খাওয়া হবে ?"

"প্রথমে এক বাটি সেদ্ধ আনাজ, বিট, গাজর, বিনস, কপি, টোম্যাটো, একটু নুন মরিচ আর লেবুর রস দিয়ে। এক কাপ ভাত। এক পিস মাছ। দু'খানা রুটি, এক বাটি চাপ-চাপ ডাল, এক বাটি টক দই আর শসা।"

"বাঃ, ভারী সুন্দর। একেবারে সুষম আহার। তারপর ?"

"আধঘণ্টা বিশ্রাম। তারপর আমার রয়্যাল এনফিল্ড মোটরবাইকে চেপে ক্লাবে।"

"ক্লাবে ? আর কোনও কাজকর্ম নেই।"

"আছে বই কী, আমার তো মেরামতি কারখানা, রিপেয়ারিং ওয়ার্কশপ।"

হরেনদা বললেন, "বাঃ, সুন্দর ব্যবসা ! মোটর-মেরামতি কারখানায় আজকাল অসহ্য রোজগার। যে-কোনও একটা জায়গায় হাত লাগালেই হাজার।"

"আজ্ঞে, মোটর-মেরামতি নয়, আমার হল দেহ মেরামতের কারখানা। বডি বিল্ডিং আর রিপেয়ারিং। যেমন ধরুন আপনি ! ওই বিশাল ভুঁড়ি, খাবা-খাবা মেদ, এরপর আপনি ব্রেকডাউন হবেন, নিলডাউন আর হতে পারবেন না, গাঁটে-গাঁটে বাত এসে যাবে। আড়াইমনি শরীরের ভারে হার্ট বসে যাবে, রক্ত তেল আর ঘিয়ে মোটা হয়ে একদিন এমন ধাক্কা মারবে চিৎপাত হয়ে যাবেন। মোটরগাড়ি হলে বডি থেকে ইঞ্জিন নামিয়ে যা হয় কিছু করা যায়, আপনার ইঞ্জিন তো আর নামানো যাবে না !"

"তা হলে ?" হরেনদার হাত থেমে গেছে। চোখ বড়-বড় হয়ে গেছে।

"তা হলে আর কী ! খরচের খাতায় নিজেকে লিখে রাখুন। প্রবাদ আছে, বেশিদিন খেতে যদি চান, কম-কম খান। হি দ্যাট ইটস লিস্ট ইটস মোস্ট। মেনি ডিশেস মেক মেনি ডিজিজেস। আমি আর কী বলব, সামনেই বসে আছেন আমাদের দেহযন্ত্রের মন্ত্রী। স্বয়ং ডক্টর মুখার্জি। তবে আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। পেয়েছি থাবায়, দশটা ডন আর বিশটা বৈঠক। মারতেই হবে। দুটো ডিম আর ছ'পিস টোস্ট ঢুকেছে উদরে।" (ক্রমশ)

ছবি : দেবাশিস দেব

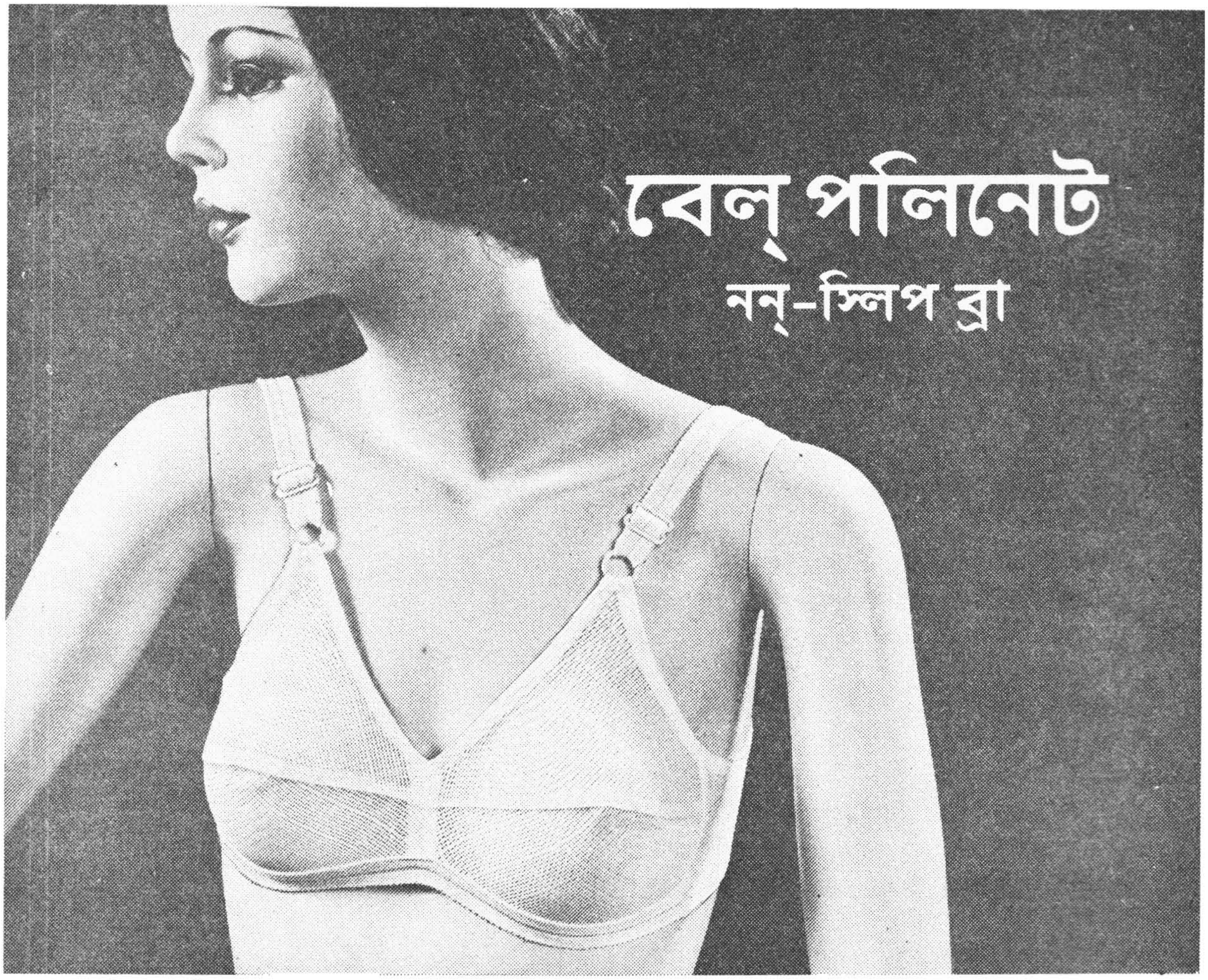

বেল পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা (মূল্য ২৩.২৫)

ত্বকে বাতাস পৌঁছতে পারে বলে বছর ভর আরাম মেলে বেশি

'বিমল' পলিনেট দিয়ে তৈরী বেল্ ব্রেসিয়ার আপনার ত্বক গ্রীষ্মে যেমন ঠান্ডা রাখে তেমনি শীতে রাখে উষ্ণ আর স্বচ্ছন্দ। কাপের নীচে এবং কাঁধে ব্যবহৃত সেরা মানের 'লাইক্রা' টেপ আপনার শরীর দৃঢ় স্বাচ্ছন্দ্যে ঘিরে রাখে। স্লিপ করে নেমে যাওয়া বা ওপরে উঠে যাওয়ার ভয় থাকে না। বহু বার ধোওয়ার পরেও শক্ত আর ফ্যাশনদুরুস্ত দেখায়।

'আইলেট স্টিচিং' আর ফিনিশিং, সহজেই আটকায় এমন শক্তপোক্ত হুকটি পর্যন্ত প্রত্যেকটি জিনিসের গুণমানের ওপর নজর—এ সবের জন্যই আজ বেল্ আপনার মত সজাগ আধুনিকা মহিলাদের প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে।

এবার ব্রা কিনলে 'বেল্ পলিনেট নন্ স্লিপ কিনুন। দেখুন দেখতে এবং পরতে কি চমৎকার লাগে।

বেল্-এর আরও যে সব নন্ স্লিপ ব্রা আছে:

কটন-কটন টেপ	১১.০০
২ x ২ রুবিয়া কটন টেপ	১৩.৫০*
কটন ইলাস্টিক টেপ	১৬.২৫
'বিমল' পলিয়েস্টার রুবিয়া	১৯.২৫
২ x ২ রুবিয়া ইলাস্টিক টেপ	২০.৫০*

*লাল, কালো, গোলাপী ও গায়ের রঙে পাওয়া যায়

belle

পলিনেট নন্-স্লিপ ব্রা

বেল্ ওয়্যারস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৫৪ বি সবারবান স্কুল রোড
কলিকাতা ৭০০ ০২৫। ফোন: ৪৮-৩৭০৮

C.86.5 R

ডিলারদের নামের তালিকা

কলিকাতা: **পূর্ণিমা**, ডবলিউ/বি ২৬, ইন্টালি মার্কেট; **যশোদা স্টোর্স**, ১০৩ বি, বিধান সরণি; **মডার্ণ ড্রেসেস**, হাতিবাগান; **কলেজ স্টোর্স**, ৫৫ কলেজ স্ট্রীট; **এইচ এন্ড আর বণিক স্টোর্স**, বালিগঞ্জ ফ্যান্সি মার্কেট; **ফ্রেন্ডস স্টোর্স**, ৭০/২০ রবীন্দ্র সরণি; **শ্রীশ্রী সত্যনারায়ণ ভান্ডার**, বড়বাজার; **বি এন্ড বি এন দে**, 'ডি ব্লক', নিউ মার্কেট; **অঙ্গশোভা**, গড়িয়া; **স্বর্ণময়ী**, যাদবপুর; **মীনাশ্রী**, বেহালা। **বীণা**, ৩৪ জি টি রোড (দক্ষিণ) হাওড়া; **সাহা ড্রেসেস**, কদমতলা; **সুমিতা**, শ্রীরামপুর; **তারক এম্পোরিয়াম**, চুঁচড়া; **পোদ্দার ক্লথ হাউস**, নৈহাটি; **শ্রীগুরু বস্ত্রালয়**, বারাসাত; **করুণাময়ী**, খাগড়া, বহরমপুর; **ইডেন ক্লথ স্টোর্স**, কৃষ্ণনগর; **সূর্য্যকমল**, কাঁথি; **কৃষ্ণ ম্যাচিং সেন্টার**, আসানসোল; **জয়শ্রী**, পুরুলিয়া; **গৌরী ড্রেসেস**, মালদহ; **রামনারায়ণ হরিকিষণ**, মেদিনীপুর; **নিউ টিপটপ**, গোলবাজার, খড়গপুর; **রীণা ড্রেসেস**, বিবেকানন্দ মিনি মার্কেট, শিলিগুড়ি।

হলদে মুখ

সার আর্থার কোনান ডয়েল

আগে যা ঘটেছে : মিঃ গ্রান্ট মনরো ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁর স্ত্রী এফি শান্ত স্বভাবের মহিলা, কিন্তু ইদানীং তাঁর আচরণ কিছুটা পালটে গেছে। এফির আগের পক্ষের স্বামী ও ছেলের মৃত্যু হয়েছিল পীতজ্বরে। দ্বিতীয় স্বামীকে এফি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি লিখে দেন। পরে তিনি মিঃ মনরোর কাছে একশো পাউন্ড চান, কিন্তু টাকাটা কেন দরকার হচ্ছে, তা জানাতে রাজি হন না। মধ্যরাতে এফি বাড়ি থেকে কাছেই একটা বাড়িতে গিয়েছিলেন, যে-বাড়ির জানালায় মিঃ মনরো একটা বীভৎস হলদে মুখ দেখেছেন। এফিকে এ-বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেন না। মিঃ মনরো তাঁর স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেই বাড়িতে ঢুকে কাউকে দেখতে পাননি। কিন্তু দেখেছেন, সেই বাড়ির একটা ঘরে এফিরই ছবি রয়েছে। তারপর···

হোমস আর আমি একটি কথাও না বলে মিঃ গ্রান্ট মনরোর অবাক করে দেওয়া অভিজ্ঞতার কথা শুনছিলুম। হোমস আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মিঃ গ্রান্ট মনরোকে জিজ্ঞেস করলে, "যে মুখ আপনি জানলার শার্শির ওধারে দেখেছিলেন, সেটা কোনও পুরুষ না মহিলার মুখ, তা বুঝতে পেরেছিলেন কি?"

"না। প্রত্যেকবারেই এত দূর থেকে দেখেছি যে, সেটা ছেলের কি মেয়ের মুখ তা জোর করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

"তবে সেই মুখটা দেখে আপনার খুবই খারাপ লেগেছিল?"

"সে-কথা ঠিক। সেই মুখের রং খুবই অস্বাভাবিক। আর মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটা কঠিন ভাব। আমি কাছাকাছি আসতেই এক ঝাঁকুনি দিয়ে মুখটা সরে গেছে প্রতিবার।"

"আপনার স্ত্রী কতদিন আগে আপনার কাছে টাকা চেয়েছিলেন?"

"তা প্রায় মাস-দুয়েক আগে তো বটেই।"

"আপনি কি মিঃ হেব্রোনের কোনও ফোটো দেখেছেন?"

"না। মিঃ হেব্রোন মারা যাবার কিছুদিন পরেই আটলান্টায় ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হয়। তাতে ওদের অনেক জিনিসপত্র পুড়ে যায়।"

"আশ্চর্য! অথচ ওদের ডেথ সার্টিফিকেটটা ওঁর কাছে রয়ে গেছে! আপনি সেই ডেথ সার্টিফিকেট তো দেখেছেন?"

"হ্যাঁ। ওটা একটা ডুপ্লিকেট।"

"আচ্ছা, আপনার স্ত্রীর আমেরিকান কোনও বন্ধু বা আত্মীয়ের সঙ্গে আপনার কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে কি?"

"না।"

"আপনার স্ত্রী কি কখনও আমেরিকায় বেড়াতে যেতে চেয়েছেন?"

"না।"

"আমেরিকা থেকে ওঁর কি চিঠিপত্র আসে?"

"না। অন্তত আমার চোখে কখনও পড়েনি।"

"ঠিক আছে। আমাকে একটু ভাববার সময় দিন। যদি ওরা বাড়ি ছেড়ে একদম চলে গিয়ে থাকে তো মুশকিল। তবে এমনও হতে পারে যে, আপনি আসছেন টের পেয়ে ওরা কাছাকাছি কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে ছিল। তা যদি হয় তো ওরা আবার ফিরে আসবে। তা হলে ব্যাপারটার ফয়সালা সহজেই হতে পারে। যাই হোক, এখন আপনি নরবেরিতে ফিরে যান। যদি দ্যাখেন যে, ওরা ফিরে এসেছে, তো আপনি আমাকে টেলিগ্রাম করে খবর দিয়ে দেবেন। আপনার টেলিগ্রাম পেলেই আমি পৌঁছে যাব। তবে আপনি নিজে থেকে কিছু করতে যাবেন না।"

"যদি বাড়িটা খালিই থাকে?"

"তা হলে কাল আমি নরবেরি যাব। সেখানে পৌঁছে যা হোক একটা ব্যবস্থা করা যাবে। ওই কথাই তা হলে রইল। একটা কথা, মিছিমিছি মন খারাপ করবেন না।"

মিঃ গ্রান্ট মনরোকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসে হোমস বললে, "বেশ গোলমেলে ব্যাপার, বুঝলে ওয়াটসন। তুমি কী বুঝলে বলো তো?"

"খুবই ঘোরালো ব্যাপার।"

"হ্যাঁ! আমার ধারণা ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করার চেষ্টা করছে কেউ।"

"কিন্তু কে সেই লোক?"

"মনে হয় দোতলার সাজানো ঘরটিতে যে বসে থাকে, সে-ই যত নষ্টের মূল। বিশ্বাস করো ওয়াটসন, ওই অস্বাভাবিক মুখের মধ্যে অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে। এই মামলা আমি কিছুতেই হাতছাড়া করব না।"

"তুমি কি কোনও সিদ্ধান্ত করেছ?"

"হ্যাঁ, মোটামুটি সিদ্ধান্ত একটা করেছি বইকী। আমার ধারণা ভুল হলেই আমি আশ্চর্য হব। আমার মনে হয়, মিঃ হেব্রোন ওই ঘরে ঘাপটি মেরে বসে আছে!"

"কেন তুমি এ-কথা বলছ?"

"এ ছাড়া মিসেস গ্রান্টের এই অদ্ভুত ব্যবহারের কোনওরকম ব্যাখ্যা করা যায় না। আমি যা অনুমান করেছি, সেটা মোটামুটি এই রকম। এই মিঃ হেব্রোন লোকটি খুব সুবিধের নয়। হয় এর স্বভাব-চরিত্র খুব খারাপ, নয় এর কোনও জটিল অসুখ ছিল। বিয়ের সময় ভদ্রমহিলা এ-সব খবর জানতেন না। পরে জানতে পারেন। আর জানতে পেরে ভদ্রমহিলা এদেশে পালিয়ে আসেন। বছর তিনেক হেব্রোনের কোনও খবর না পেয়ে তিনি নিশ্চিত হন যে, হেব্রোন আর বেঁচে নেই। পরিচিত কারওর সাহায্যে তিনি একটা ডেথ সার্টিফিকেটও জোগাড় করেন। পরে মিঃ গ্রান্টের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ইতিমধ্যে ওই লোকটা কোনওভাবে জানতে পারে যে, ভদ্রমহিলা এখানে এসেছেন এবং গ্রান্টের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছে। ওই লোকটিই ইতিমধ্যে আর একটা দুষ্টু মেয়েকে বিয়ে করেছে, হয় ওই লোকটি না হয় সেই মেয়েটি মিসেস

মনরোকে সব কথা ফাঁস করে দেবার ভয় দেখায়। মিসেস মনরো একশো পাউন্ড দিয়ে তাদের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। এইজন্যেই তিনি স্বামীর কাছে ওই টাকাটা চেয়েছিলেন। কিন্তু টাকা পেয়ে ওই লোকটা আরও টাকা আদায়ের জন্যে এদেশে আসে। তাই তার স্বামী যখন তাঁকে বললেন যে, তাদের বাড়ির কাছের খালি বাড়িটা ভাড়া হয়েছে তখনই তিনি ব্যাপারটা আঁচ করেন। তারপর গ্রান্ট না ঘুমিয়ে পড়া পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করেন। তারপর তিনি ওদের কাছে গিয়ে কাতরভাবে বলেন যে, তার ওপর তারা যেন অত্যাচার না করে তাকে সুখে-শান্তিতে থাকতে দেয়। মিসেস গ্রান্টের কথায় ওরা নিশ্চয়ই কান দেয়নি। তাই তিনি ফের সকালবেলায় ওই বাড়িতে যান। সেই সময় মিঃ মনরো তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন। দিন-দুই পরে ভদ্রমহিলা আবার ওই বাড়িতে যান। সেই সময়েই বোধহয় উনিই কোনও কারণে ওঁর ছবি সঙ্গে করে নিয়ে যান। মিসেস গ্রান্ট যখন ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন সেই সময়ে কাজের মেয়েটি এসে খবর দেয় যে, মিঃ গ্রান্ট আসছেন। তখন মিসেস গ্রান্টের কথায় ওই লোকটা আর সেই বদ মহিলা বাড়ির পেছনে যে ফারগাছের জঙ্গলটা আছে, যেটার কথা গ্রান্ট আমাদের বলেছেন, সেখানে গিয়ে গা-ঢাকা দেয়। আর সেই কারণে মিঃ গ্রান্ট মনরো বাড়ির মধ্যে দিয়ে দেখেন চিড়িয়া ভেগেছে। খাঁচা খালি। অবশ্য আজ সন্ধেবেলায় গিয়েও মিঃ গ্রান্ট যদি দেখেন, বাড়িটা খালি তা হলে আমি সত্যিই খুব অবাক হব।"

"কিন্তু এসবই তোমার অনুমান।"

"তা ঠিক। তবে এই অনুমানই ঠিক। কেননা আমরা এখনও পর্যন্ত যা জানতে পেরেছি তা সবই এই অনুমানের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে। যদি এর পর এমন কোনও তথ্য আমরা জানতে পারি যেটা এই অনুমানের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর যাচ্ছে না, তখন গোটা ব্যাপারটা নতুন করে ভাবব। এখন নরবেরি থেকে খবর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের কিছু করবার নেই।"

আমাদের অবশ্য বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। বিকেলে চা খাচ্ছি, এমন সময় গ্রান্টের টেলিগ্রাম এল। "বাড়িতে এখনও লোকজন আছে। জানালায় মুখটা ফের দেখা গেছে। সাতটার ট্রেনে আসুন। স্টেশনে থাকব। আপনারা না আসা পর্যন্ত কিছু করব না।"

আমরা ট্রেন থেকে নামলুম। মিঃ গ্রান্ট মনরো প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছিলেন। প্ল্যাটফর্মের আলোতে দেখলুম মিঃ গ্রান্ট ভীষণ উত্তেজিত।

হোমসের হাত চেপে ধরে মিঃ গ্রান্ট বললেন, "ওরা এখনও বাড়ির মধ্যে আছে। আসবার সময় দেখলুম, আলো জ্বলছে। যাই হোক, এ-ব্যাপারের ফয়সালা আজ এবং এখনই করবই।"

হাঁটতে হাঁটতে হোমস বললে, "কী করবেন ভাবছেন?"

"আমি জোর করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখব বাড়িতে কারা রয়েছে। আমি চাই যে আপনারা দুজনে সাক্ষী হিসেবে আমার সঙ্গে থাকবেন।"

"আপনার স্ত্রী কিন্তু এরকম কিছু করতে আপনাকে বহুবার বারণ করেছেন। তা সত্ত্বেও আপনি এ-কাজ করবেন?"

"হ্যাঁ, আমি মনস্থির করে ফেলেছি।"

"হয়তো আপনি ঠিকই করছেন। সন্দেহের মধ্যে থাকার চাইতে যা সত্যি তা জেনে যাওয়াই ভাল। তবে কাজটা ঘোরতর বেআইনি হচ্ছে। অবশ্য এছাড়া উপায়ই বা কী?"

মেঘ করে চারদিক অন্ধকার হয়েছিল। এখন বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। আমরা বড় রাস্তা ছেড়ে একটা গলিতে ঢুকলুম। মিঃ গ্রান্ট উত্তেজিতভাবে হনহন করে এগিয়ে চলেছিলেন। আমরা তাঁর পিছনে আসছিলুম।

"ওই যে, ওই দিকে আলো দেখতে পাচ্ছেন, ওটাই আমার বাড়ি। আর এটাই হচ্ছে সেই বাড়ি, যেখানে আমরা যাচ্ছি," মিঃ মনরো চুপিচুপি বললেন।

আমরা একটা মোড় ঘুরলুম। আর একদম বাড়িটার সদর দরজার কাছ এসে পড়লুম। অন্ধকার বাগানে প্রায় বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে একফালি আলো এসে পড়েছিল। বোঝা গেল দরজা খোলাই রয়েছে। দোতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। আমরা দোতলার ঘরের জানালার দিকে তাকিয়ে ছিলুম। দেখতে পেলুম একটা ছায়ামূর্তি জানালার শার্শির সামনে থেকে সরে গেল।

"ওই যে, ওই যে সেই লোকটা। আপনারা স্বচক্ষে দেখলেন যে, বাড়িতে লোক রয়েছে। চলুন, এইবার ভেতরে যাওয়া যাক। আপনারা আমার পিছনে আসুন," বললেন মিঃ গ্রান্ট।

আমরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলুম। হঠাৎ অন্ধকার থেকে এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে এলেন। আমি ভদ্রমহিলাকে ভাল দেখতে পাইনি। শুধু দেখলুম, তিনি দুহাত জড়ো করে অনুনয়ের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন।

"ভগবানের দোহাই, এমন কাজ কোরো না। আমার মনে হয়েছিল যে, আজ সন্ধেবেলায় তুমি হয়তো আবার এখানে ফিরে আসবে। আমার কথা শোনো, এতে তোমার ভালই হবে। আমাকে বিশ্বাস করলে তুমি ঠকবে না।"

মিঃ গ্রান্ট মনরো বেশ কঠিনভাবে বললেন, "তোমাকে যথেষ্ট বিশ্বাস করেছি। আর নয়। আমার সামনে থেকে সরে যাও। আমি আমার এই বন্ধুদের নিয়ে এ ব্যাপারের একটা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি আজ আর এক্ষুনি করে ফেলব।"

ভদ্রমহিলাকে পাশ কাটিয়ে মিঃ মনরো বাড়ির ভেতরে ঢুকলেন। তাঁর সঙ্গে আমরাও ঢুকলুম। দরজা খুলে মিঃ মনরো বাড়ির ভেতরে পা দিতেই এক মহিলা কোথা থেকে ছুটে এসে তাঁকে আটকাতে গেলেন। মহিলার বেশ বয়েস হয়েছে। গ্রান্ট মনরো তাকে জোর করে একপাশে সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোলেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করলুম। গ্রান্ট মনরো কোনও কথা না বলে একদৌড়ে দোতলায় গিয়ে যে ঘরটায় আলো জ্বলছিল সোজা সেই ঘরটার দিকে গেলেন। মিঃ মনরোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা ও-ঘরে ঢুকলুম।

বেশ সুন্দর করে সাজানো-গোছানো ঘর। একটা টেবিলের ওপর দুটো বড় মোমবাতি জ্বলছিল। আর দুটো মোমবাতি জ্বলছিল ম্যান্টেল পিসের ওপরে। ঘরের এক কোণে একটি বাচ্চা মেয়ে ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছিল। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তবে দেখলুম যে, সে একটা লাল রঙের ফ্রক আর হাত-ভর্তি দস্তানা পরে আছে। মেয়েটি আমাদের দিকে মুখ ফেরাতেই আমি দারুণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম। অদ্ভুত বীভৎস একটা হলদে মুখ। সে মুখের মধ্যে

কোনওরকম প্রাণের ছাপ বা ভাব নেই। পর মুহূর্তেই রহস্যের সমাধান হয়ে গেল। হাসতে হাসতে হোমস মেয়েটির কানের পাশে হাত দিয়ে সামান্য একটু চাপ দিতেই একটা মুখোশ খসে পড়ল। আর অমনি দেখতে পেলুম আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নিগ্রো মেয়ে। সেও খুব মজা পেয়েছে। তার মুখে হাসি আর ধরছে না। কালো মুখে সাদা দাঁত খুবই সুন্দর দেখাচ্ছিল। আমিও না হেসে পারলুম না। শুধু মিঃ গ্রান্ট স্ট্যাচুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

"মাই গড়, এর মানে কী?" খানিকক্ষণ পরে গ্রান্টই প্রথম কথা বললেন।

আর ঠিক তখনই সেই ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন, "আমিই বুঝিয়ে বলছি। আমার স্বামী আটলান্টায় আগুনে পুড়ে মারা যান। আমাদের শিশু-সন্তানটি বেঁচে ছিল।"

"তোমার সন্তান!"

গলায় ঝোলানো একটা লকেট দেখিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, "এটা আমি কোনওদিন খুলিনি।"

মিঃ মনরো বলে উঠলেন, "আমার ধারণা ওটা খোলা যায় না।"

ভদ্রমহিলা একটা স্প্রিং-এ অল্প চাপ দিতেই লকেটটা খুলে গেল। লকেটের ভিতরে একটা ছবি। নিগ্রো ভদ্রলোকের ছবি। ভদ্রলোকের মুখটি ভারী সুন্দর।

ভদ্রমহিলা বললেন, "ইনিই জন হেব্রোন। এঁর মতো উদার, এত বড় মানুষ আমি কমই দেখেছি। মুশকিল হল কী, আমাদের মেয়েকে আমার মতো দেখতে হল না। হল তার বাবার মতো দেখতে।

"আমি যখন আমেরিকা থেকে চলে আসি, তখন একে সঙ্গে আনিনি। ছোটবেলায় এর স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। আমার মনে হয়েছিল যে, ইংল্যাণ্ডের আবহাওয়া এর বোধহয় সহ্য হবে না। আটলান্টায় আমাদের কাজের মেয়েটি খুবই বিশ্বাসী ছিল। আমি তার জিম্মায় এই মেয়েকে রেখে আসি। তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হল, তখন এর কথাটা বলব-বলব করেও বলা হয়নি। তবে ভেবো না যে, আমার মেয়ের সঙ্গে আমি সম্পর্ক চুকিয়ে দিতুম। একসময়ে তোমাকে আমি সব কথাই খুলে বলতুম। এইরকম করে চলছিল। বছর তিনেক ওকে ছেড়ে থেকে একদিন ওকে দেখবার জন্যে আমার ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল। আমি ঠিক করলুম যে, ওকে এখানে নিয়ে আসব। আমি একশো পাউণ্ড পাঠিয়ে দিলুম। আমি আমাদের কাছাকাছি খালি বাড়িটার কথাও জানিয়ে দিই। আমি ওই কাজের মেয়েটিকে লিখে দিয়েছিলুম যে, একে যেন বাড়ির বাইরে না বের করে। পাড়ায় নিগ্রো মেয়ে এসেছে, এ-কথাটা জানাজানি হবে। এখন মনে হচ্ছে যে, সবকিছু চেপে না গিয়ে তোমাকে খুলে বললেই বোধহয় ভাল হত।

"যাই হোক, তুমিই আমাকে খবর দিলে যে, ও-বাড়িতে লোক এসেছে। সকাল হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারলুম না। তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ মনে করে আমি চুপিচুপি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। তুমি অবশ্য পরের দিন সেই রাত্রের ব্যাপারটা জানবার জন্যে কোনও রকম জোরাজুরি বা জেদাজেদি করো নি। দিন-তিনেক পরে তুমি যেদিন ওই বাড়িতে ঢুকলে তখন মেয়েটা আর নার্স কোনওরকমে পিছনে ফারগাছের জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। যাই হোক, আজ তুমি সব কথা শুনলে। এখন বলো, আমার মেয়ের আর আমার কী হবে?"

মিনিটখানেক চুপ করে থেকে গ্রান্ট মনরো যা বললেন তা শুনে আমার কান জুড়িয়ে গেল। ছোট্ট মেয়েটাকে কোলে তুলে নিয়ে গ্রান্ট বললেন, "চলো, বাড়ি যাওয়া যাক। তুমি আমাকে যতটা বদ লোক বলে মনে করো, আমি ততটা বদ লোক নই।"

ওঁরা তিনজনে বাড়ির রাস্তা ধরলেন। হোমস আর আমি ওদের পিছু পিছু আসছিলুম। বড় রাস্তায় এসে হোমস আমার কানে কানে বললে, "এখানে আমাদের আর কোনও কাজ নেই। চলো, লণ্ডনে ফিরে যাই।"

এর পর হোমস এই কেসটা নিয়ে আর একটি কথাও বললে না। শুধু শুতে যাবার আগে বললে, "ওয়াটসন, এর পরে কোনও রহস্যের মীমাংসার সময় তোমার যদি মনে হয় আমি একটু সবজান্তাগিরি করছি বা তদন্ত করবার সময় যতটা মনোযোগ দেওয়া উচিত, ততটা দিচ্ছি না, তা হলে আমার কানে কানে 'নবেরি' কথাটা উচ্চারণ কোরো।"

অনুবাদ : সুভদ্রকুমার সেন

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

শার্লক হোমসের পরবর্তী গোয়েন্দা-গল্প

নতুন চাকরি

আগামী সংখ্যায় শুরু হচ্ছে

ধাঁধা

বাংলা নববর্ষে ছোট্‌কার অফিসে এ-বছর বিরাট উৎসব ছিল। আগে, সাহেবি আমলে, ছোট্‌কাদের অফিসে খুব ঘটা করে পালন করা হত ক্রিসমাস-উৎসব বা নতুন বছরের সূচনা-উৎসব। গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে তো বাঁধা ছিল চারদিনের ছুটি। এখন সাহেবরা নেই, উৎসবের চেহারাও ক্রমশ কমতে-কমতে নেইতে এসে ঠেকেছে। সেইসব কথা ভেবেই নাকি এ-বছর পয়লা বৈশাখের দিনে বাঙালি পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানিতে বিরাট এক উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। উৎসবটা যেহেতু বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে, খাওয়াদাওয়াও নাকি বিশুদ্ধ বাঙালি মতে। ঘি, সুক্তো, ডাল, ভাজা থেকে শেষপাতের পায়েস পর্যন্ত সমস্তকিছুতে বাঙালি হেঁশেলের ঐতিহ্য বজায় রাখা হয়েছিল।

ছোট্‌কার মুখ থেকেই শুনছিলাম এসব কথা। ছোট্‌কা নাকি খাওয়াদাওয়া কমিটির অন্যতম সম্পাদক ছিল এবার। আর সেই সূত্রেই ক্যান্টিন থেকে ধার নিয়েছিল একশোটি কাঁচের গ্লাস। সেই কাঁচের গ্লাসের ব্যাপারটা নিয়েই মোটামুটি একটা ধাঁধা হয়ে যায়। অফিসের খাওয়াদাওয়ার গল্পের সঙ্গে ফাউ হিসেবে ছোট্‌কা শুনিয়েছে ধাঁধাটা।

এবারের প্রথম ধাঁধা হিসেবে সেটাই দেওয়া যাক।

প্রথম ধাঁধা ॥ একটা অফিসের ক্যান্টিন ম্যানেজারের নাম, ধরা যাক, যোগেনবাবু। ক্যান্টিন থেকে একশোটা কাঁচের গ্লাস অফিস-ফিস্টের জন্য ধার চাওয়া হয়েছে।

যোগেনবাবু করলেন কী, ক্যান্টিনেরই এক পুরনো বেয়ারাকে কাঁচের গ্লাসগুলো দিয়ে আসা নিয়ে আসার পুরো দায়িত্ব দিলেন। সেইসঙ্গে, উৎসাহ দেবার জন্য, একটা লোভনীয় শর্তও জুড়ে দিলেন।

শর্তটা হল এইরকম : যে-কটা গ্লাস অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে আনবে সেই বেয়ারা, তার উপর হিসেব করে গ্লাস-পিছু ৩ পয়সা করে বকসিস দেবেন তাকে। আর ভাঙলে গ্লাস-পিছু আদায় করবেন ৯ পয়সা করে।

পরদিন দেখা গেল, বেয়ারাটার প্রাপ্য হয়েছে মোট দু'টাকা চল্লিশ পয়সা।

ক'টা গ্লাস ভেঙেছিল, বলা যায় এর থেকে?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কিছুতেই 'হ্যাঁ' বলা যায় না?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ জট ছাড়াও—

দাবাদবানু

গতবারের উত্তর ॥ (১) ৫৪ টাকা। প্রবন্ধের বই ১৮ টাকা, অভিধান ২৪ টাকা। (২) অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বুড়ো আংলা'। (৩) মহামহিম।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

১		২	■	৩		৪
	■	৫	৬		■	
৭		■		■	৮	
	■	৯		১০	■	
■	■		■		■	■
১১	১২		■	১৩	১৪	১৫
১৬			■	১৭		

সংকেত : পাশাপাশি : (১) যক্ষরাজ। (৩) পাখির নাম। (৫) তপ্ত ধোঁয়ায় আকাশে ওড়ে। (৭) লব্ধবস্তুর সংরক্ষণ। (৮) ত্রাণকর্তা। (৯) অজগর। (১১) সরস্বতী। (১৩) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। (১৬) রবীন্দ্রনাথের 'হাট' কবিতায় এর নাম আছে। (১৭) যার দৌলতে লিখি পড়ি আঁকি।

উপর-নীচ : (১) বিখ্যাত পৌরাণিক রণাঙ্গন। (২) আপস। (৩) নদীর পাড়ে বা পাহাড়ে নামে। (৪) পাপাত্মা। (৬) সমুদ্রস্নানে সাহায্য করে। (৯) মাঠ। (১০) তিলক। (১১) চতুর্বেদের একটি। (১২) মকুফ। (১৪) কাকের আঞ্চলিক রূপ। (১৫) রাজ্য।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

স	মি	ধ	■	ঋ	ষ	ভ
তী	■	রা	ব	ণ	■	র
র্থ	■	■	ভ্রূ	■	■	নী
■	বু	ড়ি	বা	লা	ম	■
■	ল	■	হ	■	ধু	■
আ	বু	■	ন	■	ক	লি
তা	ল	ব্য	■	স	র	মা

রঞ্জন

মজার খেলা

পাঁচটা পোড়া দেশলাইকাঠি কিংবা টুথপিক জোগাড় করতে হবে এবারের মজার খেলার জন্যে।

কাঠি পাঁচটাকে নীচের ছবির মতন টেবিলে সাজাও—

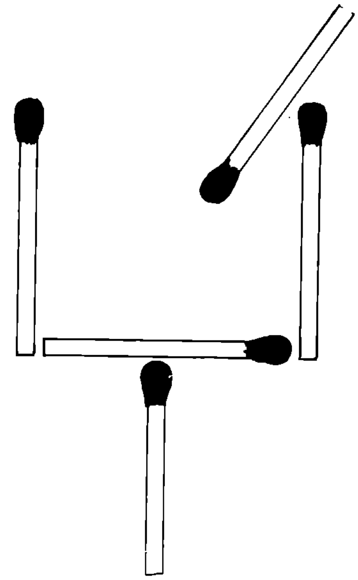

ছবিটা দেখে কিছু বুঝতে পারছ ? আসলে, চারটে কাঠি দিয়ে তৈরি হয়েছে একটা গ্লাস। আর পঞ্চম কাঠিটা স্ট্র।

এখন কী করতে হবে শুনে নাও। স্ট্রটাকে গ্লাসের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু স্ট্রটা সরালে চলবে না। গ্লাসের কাঠিগুলো থেকেই দুটো মাত্র কাঠি সরিয়ে ব্যাপারটা করতে হবে। আবার গ্লাসের চেহারাটা যেন না পালটায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে কিন্তু।

শক্ত লাগছে ? বেশ, তা হলে উত্তরটা দেখেই নাও। তবে বন্ধুদের সহজে সমাধান বাতলে দিয়ো না যেন। তারা চেষ্টা করুক।

কীভাবে দুটো কাঠি সরছে নীচের ছবিতে লক্ষ করো—

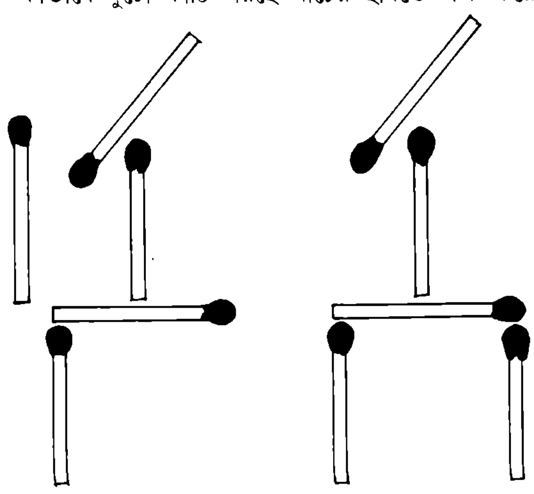

গ্লাসটা উলটে গেছে ? তা যাক, স্ট্রটা তো বাইরে রয়েছে। কী বলো ?

মজারু

হাসিখুশি

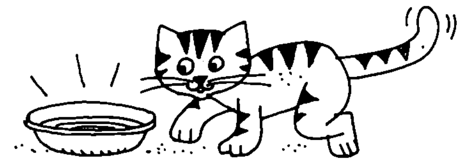

"বেড়ালের সঙ্গে দুধের মিল কোথায় বলতে পারো টুবলু ?"

"পারি স্যার। দুটোরই ছানা হয়।"

"কলোসিয়াম কোথায় বাবা ?"

"তোমার মাকে জিজ্ঞেস করো তো। জিনিসপত্র কোথায় যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখেন !"

এক দোকানের বিজ্ঞাপন : ঘড়িকে দোষ দেবেন না, নিজে সময় মেনে চলুন।

"ওয়েটার, রোস্ট-করা মুরগির একটা পা ভাঙা।"

"তা হলে বোধহয় কোনও মুরগির সঙ্গে ওর যুদ্ধ হয়েছিল।"

"ঠিক আছে, বিজয়ী মুরগিটাই নিয়ে এসো।"

"বিনয়, বাদল, দিনেশের পদবি কী ছিল তাতান ?"

"বাগ, স্যার।"

"আজকাল লেখাপড়ায় তুমি খুব ফাঁকি দিচ্ছ তোতন। কাল তোমার বাবাকে একবার স্কুলে আসতে বলো, একটা পরামর্শ করতে হবে।"

"বাবা ফি চাইলে কী করবেন স্যার ?"

"কেন, ফি চাইবেন কেন ?"

"বাবা যে নামকরা উকিল। কোনও পরামর্শ করলেই ফি চান।"

"ব্যধিকরণ বহুব্রীহির একটা উদাহরণ দিতে পারো বাবুয়া ?"

"পারি স্যার। নরেশবাবু ক্যান্সারে ভুগছেন।"

"বর্ণবিপর্যয় কাকে বলে পিকলু ?"

"মাস্টারমশাই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে উত্তরটা যখন গলার মধ্যে আটকে যায়।"

ছবি : দেবাশিস দেব

"এখন এমন এক সাবান পেয়েছি, যা দেখি লাক্সের চেয়েও চমৎকার!"—দেবশ্রী রায়

নতুন লাক্স

মনমাতানো নতুন সুবাস

ফুলের মিষ্টি মধুর গন্ধের তাজা সুবাস, যার পঞ্চমুখে প্রশংসা চিত্রতারকাদের নিজের ভাষায়— 'দারুণ,' 'মনোরম' 'অপূর্ব'।

দর্শনীয় নতুন রূপ

আপনার মতনই দর্শনীয় আর আধুনিক আর দারুণ আকর্ষণীয়। তিনটি মনোমুগ্ধ করা রঙে: গোলাপী, সবুজ আর হলদে।

হিন্দুস্থান লিভার লিমিটেডের এক উৎকৃষ্ট উৎপাদন

1LL-2250

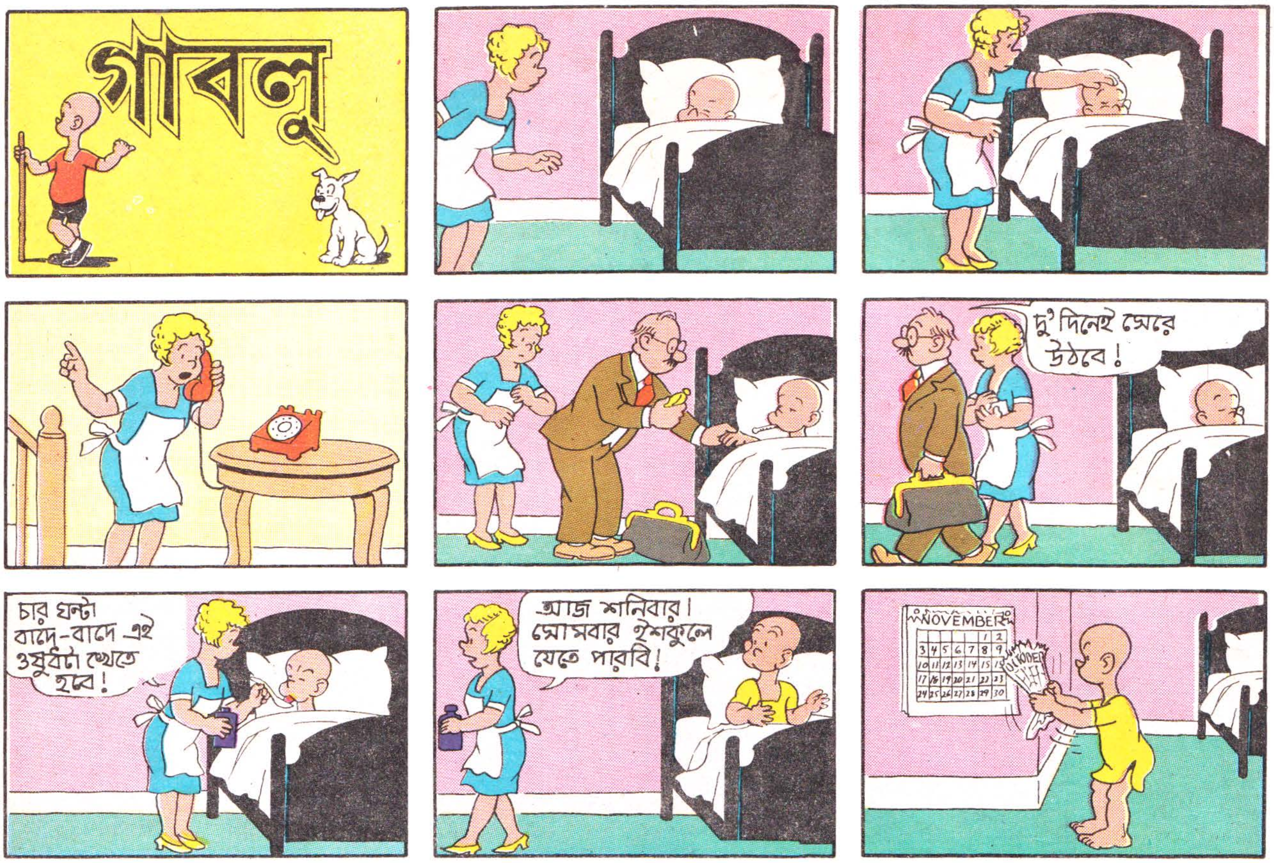

গাবলু
দু' দিনেই সেরে উঠবে!
চার ঘন্টা বাদে-বাদে এই ওষুধটা খেতে হবে!
আজ শনিবার। সোমবার ইশকুলে যেতে পারবি!
NOVEMBER

গাবলু
বাবা বাড়ি আসুক, তখন বলব।
গাবলু একটা ছোট্ট রেডিয়োর জন্য বায়না ধরেছে।
একটা নাকি পছন্দও করে রেখেছে।
চল, তা হলে, দেখি কী দাম।
রেডিও
রেডিও সেট
মোটরগাড়ির দোকান
এখুনি কিনবেন?
দাম মাত্র এক লাখ

হায়, ভারতীয় টেনিস !

সুজয় সোম

কলকাতার সাউথ ক্লাবের ঘাসের কোর্টে ডেভিস কাপের খেলা মানেই ভারতের জয়, এটাই চলে আসছিল। ১৯৮৬তে কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। চেকোস্লোভাকিয়ার কাছে ৪-১ ম্যাচে হেরে প্রথম রাউন্ডেই বিদায়। হায়, ভারতীয় টেনিস !

ব্যাপারটা খুলে বলি। সাতই মার্চ, শুক্রবার সকালে রমেশ কৃষ্ণন যখন স্ট্রেট সেটে (৬-৪, ৬-২, ৭-৫) টমাস স্মিডকে হারিয়ে দিলেন, আমরা খুশিতে ডগমগ। টমাস দেখার মতো কতকগুলো ডাউন দ্য লাইন ব্যাকহ্যান্ড পাসিং শট মারলেও, আগাগোড়া দাপট দেখালেন রমেশ। যেমন আক্রমণের ভঙ্গি, তেমনি ঠাণ্ডা মাথায় রিল্যাক্সড টেনিস। সার্ভিস ফিরিয়ে বল নিচু করে ফেললেন টমাসের পায়ের ডগায়। নেটের খুব কাছে ধেয়ে আসতে দেখে টমাসের মাথার ওপর দিয়ে লব করলেন, বেচারা ভলি নিতে গিয়ে বেকায়দায় !

দ্বিতীয় সিঙ্গলসে লম্বা, স্বাস্থ্যবান, চটপটে তরুণ মিলাস্লাভ মেসির মোটে দাঁড়াতে দিলেন না ভারতীয় অধিনায়ক বিজয় অমৃতরাজকে। ৬-০, ৭-৫, ৬-৪। লড়াইয়ের মেজাজটাই দেখলুম না ক্যাপ্টেনের মধ্যে। বড্ড ক্লান্ত, ঢিলেঢালা। প্রথম সার্ভিস বারে বারে নষ্ট করলেন। আর মেসির গোটা কোর্ট জুড়ে সার্ভ, ভলি, পাসিং শটের বাহারি প্রদর্শনীতে মেতে উঠলেন। মেসিরের ব্যাকহ্যান্ড সার্ভিস রিটার্ন দুর্দান্ত। বিশেষ করে যখন দু'হাতে ব্যাকেটের হাতল ধরে রিটার্ন করলেন।

শনিবারে ডাবলসের খেলায় টমাস স্মিড ও পাভেল স্লোভিল ৬-২, ৯-১১, ৬-৪, ৬-৫ সেটে জিতলেন। প্রথম সেটের শুরু থেকেই বিজয় ও আনন্দ অমৃতরাজ জুটি নার্ভাস। দুজনেই একগাদা এলোমেলো শট নিলেন। আনন্দ এতটুকু আত্মবিশ্বাসী ছিলেন না। প্রথম দুটো সার্ভিস গেম্ই হারালেন। টমাস ও পাভেল টেক্কা দিলেন তৎপরতা, অনুমান-ক্ষমতা, পারস্পরিক বোঝাপড়ায়। দ্বিতীয় সেটের মাঝামাঝি নাগাদ আচমকা খেলাটা উপভোগ্য হয়ে উঠল। ভারতীয়দের হঠাৎ ঝলসে-ওঠা (বিশেষ করে আনন্দের সার্ভিস এবং সার্ভিস রিটার্ন) দেখে আমরাও টানটান হয়ে বসলুম। স্কোর যখন ৯-৯, পাভেলসায়েব স্নায়ুচাপে কাবু ! পরপর দুবার ডাবল ফল্ট ! তবে আমাদের তুলনায় চেক-জুটির সার্ভিস রিটার্ন ও নেটের কাছে খেলা ঢের ভাল। রিফ্লেক্স, ওভারহেড স্ম্যাশও দারুণ। তৃতীয় সেট চমৎকার শুরু করেও বিজয় নবম গেমে নিজের সার্ভিস খোয়ালেন। অমনি ম্যাচ ফশকে গেল।

রোববার, তৃতীয় দিনের সকালে যা ঘটল, সেটা দুঃখের কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। টমাস স্মিডের বিরুদ্ধে খেলার শুরুতে তরতাজা বিজয় নিজের অসাধারণত্ব ছুঁতে চেয়েছিলেন। তাঁর কাছ থেকে কিছু পুরনো ঝাঁজ (প্রথম সেটে দুবার সার্ভিস ভাঙা এবং 'এস' সার্ভিস) পেলুম, কিন্তু টমাসের খেলার ছন্দ, গতি এবং ধারালো সার্ভিস, ব্যাকহ্যান্ড সার্ভিস রিটার্ন, পাসিং শটে শেষ পর্যন্ত নাজেহাল। ৩-৬, ৬-৩, ৬-১, ৬-২। ম্যাচ যত এগোল, ক্লান্ত দলপতির ততই শর্ট সার্ভিস, দুর্বল রিটার্ন, যাচ্ছেতাই ওভারহেড স্ম্যাশ।

নিয়মরক্ষার শেষ সিঙ্গলস তিন সেটে নামিয়ে আনা হল। মন দিয়ে খেলার বা লড়াইয়ের কোনওরকম ইচ্ছে ছিল না রমেশের। ৩-৬, ২-৬ সেটে হেরে গেলেন। মেসিরের সার্ভিস, কোর্টে চলাফেলার গতি কিংবা ফোরহ্যান্ডের ভলি, পাসিং শটের স্পিড বোধহয় রমেশও উপভোগ করলেন। মেসিরের ডাবল-হ্যান্ডেড ব্যাকহ্যান্ড শট তো অসাধারণ।

সবচেয়ে জরুরি কথাটা সরাসরি বলি। অমৃতরাজ ভাইদের বয়স হয়ে গেছে। তাঁরা জীবনের সেরা সময়ে নিজেদের উজাড় করে দিয়েছেন ভারতীয় টেনিসকে, কিন্তু এখনও ওঁদের ওপর নির্ভরতা কেন ? টানা তিনদিন ডেভিস কাপে খেলার ধকল সামলানো বিজয়ের পক্ষে আর সম্ভব নয়। অন্তত রমেশ কৃষ্ণনের পাশাপাশি আর-একজন তরুণ সিঙ্গলস খেলোয়াড় এক্ষুনি দরকার। রমেশকেও ডাবলসে পোক্ত হতে হবে।

ডেভিস কাপে চেকোস্লোভাকিয়ার টমাস স্মিড

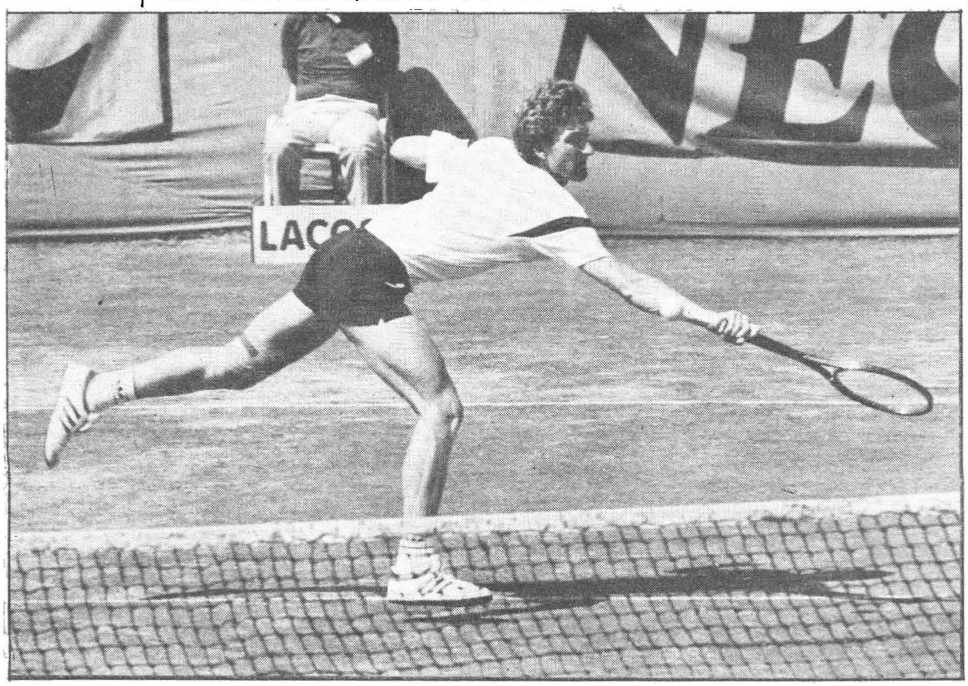

হায় ফুটবল !

রত্না শূর

কী আশ্চর্য ! একদিকে ভারতীয় ফুটবল দলের শতকরা অন্তত ষাটজন খেলোয়াড় ক্রমাগত বাংলা থেকে নির্বাচিত হচ্ছেন, অন্যদিকে জাতীয় ফুটবলে বাংলার সেরা স্থান দখলের ব্যর্থতা উত্তরোত্তর বেড়ে উঠছে।

একদিকে বাংলার ফুটবলারদের দাম হাজার হাজার টাকা থেকে লাখে লাখে পৌঁছতে শুরু করেছে। অন্যদিকে জাতীয় ফুটবলে বাংলার নক্ষত্ররা ক্রমশই পরাজিত নায়কের ভূমিকায় অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন।

কয়েক বছর আগেও সন্তোষ ট্রফি জয়ে বাংলার ব্যর্থতাকে অঘটন হিসেবে চিহ্নিত করা হত। আজও অঘটনই। তবু মনে রাখা দরকার, ভারতের সেরা নক্ষত্রখচিত দল জাতীয় ফুটবলে পর পর তিনবার এই অঘটন ঘটাল।

তিরাশিতে গোয়ার সঙ্গে যুগ্মভাবে সন্তোষ ট্রফি জেতার পরে আর একবার জাতীয় ফুটবলের আসর থেকে বাংলার ফুটবলাররা সন্তোষ ট্রফি জিততে পারলেন না কেন ? বিয়াল্লিশতম জাতীয় ফুটবলের ফলাফলে এই প্রশ্নটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। 'বুড়োদের দল' পঞ্জাব পরপর দু'বছর সন্তোষ ট্রফি দখলে রেখে বাংলার বর্তমান দলের অসারত্ব চোখে আঙুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিল।

খেলার নিষ্পত্তি হয়েছে টাই-ব্রেকারে। টাই-ব্রেকারের ৪-২ ফলাফলের সঙ্গে মূল খেলার বিস্তর ফারাক আছে বটে, তবু এই ফলাফলটুকুই কেবল জাতীয় ফুটবলের সেই ইতিহাসে লেখা থাকবে যেখানে বিয়াল্লিশবারের মধ্যে কুড়িবার এককভাবে ও একবার যুগ্মভাবে বাংলার সন্তোষ ট্রফি জয়ের ঐতিহ্যময় গৌরব পর্ব গাঁথা আছে।

বাংলার ফুটবল সম্পর্কে যাঁদের একটু বেশি প্রীতি আছে, তাঁরা হয়তো বলবেন, বাংলার ফাইনালে পৌঁছনোই কি কম কৃতিত্বের ? এবার নিয়ে বাংলা বিয়াল্লিশবারের মধ্যে মোট একত্রিশবার ফাইনালে পৌঁছল। এই কৃতিত্বকে ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই। বিশেষ করে গত দু'বছর বাংলার ব্যর্থতা এই কৃতিত্বকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। কিন্তু, তারপর কী হল ? আসল দরজায় পৌঁছবার পর আলিবাবা চিচিং ফাঁক মন্তরটাই ভুলে গেলেন, এই বিস্মৃতির শিকার শুধু বাংলা নয়, পঞ্জাবও। ১২০ মিনিট ধরে গোলের কানাগলিতে ছুটে বেড়িয়েছেন ভারতের দুই সেরা দলের খেলোয়াড়রা। এশিয়াডের বছরে এ-ব্যাপারটাই ভারতীয় ফুটবলের পক্ষে সবচেয়ে মর্মান্তিক। কুশলী ফরোয়ার্ডদের অভাব জাতীয় ফুটবলের কর্মকর্তাদের কপালে দুশ্চিন্তার রেখা গভীরতর করবে, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। পঞ্জাব তবুও বিজয়লক্ষ্মীকে নিজেদের অনুকূল রাখতে পেরেছে। কিন্তু জয় সম্পর্কে বাংলার ঔদাসীন্য দুর্ভাগ্যজনক।

চুরাশিতে চুনী গোস্বামী অভিযোগ করেছিলেন, ক্লাবের জন্য ফুটবলাররা নিজেদের যতটা উজাড় করে দেন, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক স্তরে ততটা আন্তরিকভাবে খেলেন না। অভিযোগটি যে একেবারে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ ফেডারেশন কাপের ফলাফলে মেলে। চ্যাম্পিয়ান ক্লাব অব ইন্ডিয়ার একচ্ছত্র আধিপত্যে বাংলা ভিন্‌রাজ্যকে ভাগ বসাতে দেয় না।

ক্লাবভিত্তিক ফুটবলের আরেক দুষ্ট গ্রহ ইদানীং সন্তোষ ট্রফির আসরে বাংলার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত বছর কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বাংলার বিদায়ের পর ক্ষুব্ধ কোচ অশোকলাল ব্যানার্জি অভিযোগ করেছিলেন, দলবদলের আগে ফুটবলাররা পা বাঁচিয়ে খেলেছেন। এই অভিযোগ নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হলেও এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, দলবদলের প্রাক্-মুহূর্তে বাংলার নক্ষত্র-ফুটবলারদের মনঃসংযোগ শুধু সন্তোষ ট্রফিতে কেন্দ্রীভূত থাকে না। সাম্প্রতিককালে জাতীয় ফুটবলের আসরে বাংলার তিন প্রধান দলের ভূমিকা ক্রমশই বাংলার ফুটবলের স্বার্থবিরোধী হয়ে উঠছে। এ ব্যাপারে আই· এফ· এ·'র অবিলম্বে সতর্ক হওয়া দরকার।

আমাদের ফুটবলারদের শারীরিক সক্ষমতার কথাও ভেবে দেখা দরকার। এ-ব্যাপারে বাংলার অন্যতম ফুটবল-বিশেষজ্ঞ অরুণ সিংহের বক্তব্য হল, 'ফুটবলারদের কাঁধে বেশি বোঝা চাপিয়ে দিলে এই হয়। চুনী-প্রদীপরা সারা বছর যত ম্যাচ খেলত, আজকের ফুটবলাররা সারা বছর তার দ্বিগুণ ম্যাচ খেলে। একই ফুটবলারকে সারা বছর ক্লাবের হয়ে দশটা টুর্নামেন্টে খেলাবার পর আবার রাজ্য ও জাতীয় দলের জার্সি পরিয়ে সম্মান রক্ষার জন্য মাঠে পাঠানো হচ্ছে। বাংলা যখন নিয়মিত সন্তোষ

পঞ্জাবের গোলরক্ষক বল ধরছেন

ট্রফি জিতত তখন ফুটবলারদের কাঁধে এই গুরুভার ছিল না। ক্লান্ত বিধ্বস্ত ফুটবলারদের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা অন্যায়।'

বাংলার ফুটবলারদের সঙ্গে শুধু বাংলা নয়, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎও জড়িত। জাতীয় ফুটবলের আসর ভারতীয় দল নির্বাচনেরও অন্যতম মাপকাঠি। এই আসরে ভারতের অন্য রাজ্যের ফুটবলারদের মতো বাংলার ফুটবলাররাও যেন সেরা খেলাটুকু উপহার দিতে পারেন, তার দায়িত্ব এ· আই· এফ· এফ· ও আই· এফ· এ·'কে যৌথভাবে পালন করতে হবে। বাংলার ফুটবলের উন্নতি হলে ভারতীয় ফুটবল যে সমৃদ্ধ হবে, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

জ্যাটোপেক, জ্যাটোপেক

সম্রাট রায়

কয়েকটা দিন দারুণ হৈ-চৈ হল জ্যাটোপেক দম্পতিকে নিয়ে। রাজ্য ক্রীড়া-দিবস উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন চেকোস্লোভাকিয়ার দুই কিংবদন্তী-অ্যাথলিট, এমিল জ্যাটোপেক ও তাঁর স্ত্রী ডানা জ্যাটোপেকোভা। ওঁরা কে ছিলেন, এটা বোঝাতে হলে অতীত ইতিহাসের পাতা ওলটাতেই হবে।

এমিলকে বলা হত 'হিউম্যান লোকোমোটিভ', অর্থাৎ 'মানব ইঞ্জিন'। আর-পাঁচটা মানুষের মতো সাধারণ আকৃতি। কিন্তু অসাধারণ ছিল তাঁর স্ট্যামিনা। দূরপাল্লার দৌড়ে তাঁর ওই স্ট্যামিনা-বোঝাই শরীরটির কথা ভেবেই সম্ভবত তাঁকে 'হিউম্যান লোকোমোটিভ' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

'৪৮ লণ্ডন ওলিম্পিকে ১০ হাজার এবং ৫ হাজার মিটার দৌড়ে যথাক্রমে সোনা ও রুপো জিতেছিলেন এমিল জ্যাটোপেক। কিন্তু '৫২ হেলসিঙ্কি ওলিম্পিকে একেবারে হই-চই ফেলে দেন তিন-তিনটি সোনা জিতে। পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার ছাড়া ম্যারাথনেও তিনি স্বর্ণ জয় করেন। এবং তিনটিতেই গড়েন ওলিম্পিক রেকর্ড। ওলিম্পিকের ইতিহাসে দূরপাল্লার দৌড়ে এমন তিনটি প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য ইভেন্ট জয়ের নজির বিশ্বের আর কোনও অ্যাথলিটের নেই। ৫ থেকে ৩০ হাজার মিটারের মধ্যে বিভিন্ন দৌড়ে এমিল বিশ্ব-রেকর্ড ভাঙেন ১৮ বার। ১৯৪৯—'৫১ টানা ৬৯টি দৌড়ে তিনি ছিলেন অপরাজিত। জীবনে মোট ৩৩৪টি দৌড়ের মধ্যে তিনি জেতেন ২৬১টিতে। মনে রাখার মতো ঘটনা হচ্ছে অ্যাথলেটিকসে চেকোস্লোভাকিয়াকে প্রথম ওলিম্পিক সোনা উপহার দেন তিনিই।

এমিলের স্ত্রী ডানা নামী জ্যাভলিন থ্রোয়ার। '৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে তিনি সোনা জিতেছিলেন ৫০·৪৭ মিটার দূরে বর্শা নিক্ষেপ করে। '৬০ রোম ওলিম্পিকেও ডানা ৫৩·৭৮ মিটার দূরে বর্শা ছুঁড়ে রুপো পান। চেক মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশিবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার রেকর্ড ডানার ('৪৬—'৬৪)। সবচেয়ে বয়স্ক মেয়ে প্রতিযোগী হিসেবে বর্শা ছোঁড়ায় বিশ্ব-রেকর্ড ভাঙার গৌরবও তাঁর (৩৫ বছর ২৫৫ দিন)। এমিলের মতো ডানাও অ্যাথলেটিকসে মেয়েদের প্রথম ওলিম্পিক-স্বর্ণপদক উপহার দেন চেকোস্লোভাকিয়াকে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই বিরাট অ্যাথলেটিক কেরিয়ার। দু'জনের একটা আশ্চর্য মিলও রয়েছে। দু'জনেরই জন্ম একই দিনে (১৯ সেপ্টেম্বর, ১৯২২)।

৩০ বছর আগে এমিল ও ডানা একবার কলকাতায় এসেছিলেন। স্থানীয় ক্রীড়াবিদদের উৎসাহ দেবার জন্য মোহনবাগান স্পোর্টসে অংশ নিয়েছিলেন। সেবারই বাংলার ম্যারাথন রানার গুলজারা সিংকে এমিল খুলে দিয়েছিলেন নিজের রানিং-শ্যু। শ্রদ্ধায় সম্মানে সেই রানিং-শ্যু গ্রহণ করেছিলেন গুলজারা। আর ঠিক পরের বছরই জাতীয় প্রতিযোগিতায় ম্যারাথনে তিনি ফার্স্ট হয়েছিলেন। এবার এমিল আসছেন শুনে গুলজারা ছুটে এসেছিলেন বেনারস থেকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও প্রৌঢ় এমিল কিছুতেই মনে করতে পারেননি গুলজারাকে।

বেটন কাপের যুদ্ধে

অজয় বর্মা

এশিয়ার সবচেয়ে পুরনো হকি প্রতিযোগিতা বলতে কলকাতার বেটন কাপ। দশ বছর আগেও বেটন কাপের ছিল ভারতের সেরা হকি-যুদ্ধের মর্যাদা। সে কী রমরমা, জৌলুস, গ্ল্যামার! বেটন কাপকে বলা হত 'ব্লু-রিবাণ্ড অব্‌ ইণ্ডিয়ান হকি'। ছিয়াশিতে বসল একানব্বুইতম আসর। বসল মানে নাম-কা-ওয়াস্তে! সেমিফাইনাল বা ফাইনালের খেলাতেও মাঠে যেমন ভিড় দেখলুম, বোধহয় কলকাতার যে-কোনও পাড়ার প্রদর্শনী ফুটবল ম্যাচেও এর চেয়ে বেশি দর্শক জুটে যায়! কলকাতার বাইরের দলগুলোও বেটন কাপকে তাচ্ছিল্য করল। বেঙ্গল হকি অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা ভিন রাজ্যের চৌদ্দটা দলকে নেমন্তন্ন করেছিলেন। শেষমেশ এল মোটে পাঁচটা দল!

সেমিফাইনালের আগের খেলাগুলো নিয়ে কিছু না-ই বা লিখলুম। তবে হ্যাঁ, জলন্ধরের ফৌজি দল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং (ই· এম· ই·)-এর কাছে কোয়ার্টার ফাইনালে মোহনবাগান হেরে গেল, এ-খবরটা জানানো দরকার। মোহনবাগানের ফরোয়ার্ডরা উঠে-পড়ে লেগে নটা পেনাল্টি কর্নার আদায় করে ই· এম· ই'র আঁটোসাঁটো ডিফেন্স টপ্‌কে একটা গোল দিতে পারলেন ভাণ্ডারি। আর হজম করতে হল কিশোর এক্কা ও উইলিয়াম কুজুরের দুটো গোল।

বারোই মার্চ, বুধবার ভরবিকেলে মোহনবাগান মাঠে হাজার-দুয়েক দর্শক এক জোড়া সেমিফাইনালের লড়াই দেখলেন। তার মধ্যে হাজারখানেক লোকই সেনাবাহিনীর! প্রথম খেলায় বাঙ্গালোরের মাদ্রাজ এঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ (এম· ই· জি·) ৫—৪ গোলে হারাল ই· এম· ই'কে। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের প্রথম পর্ব গোলশূন্য। দ্বিতীয়ার্ধে দুটো গোল হল। 'ই· এম· ই'র এস বোরা পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে যেই গোল করলেন, পড়ি-মরি অ্যাটাক করে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল শোধ করলেন সুব্রমনিয়ম। খেলার ফয়সালা হল টাইব্রেকারে। এম· ই· জি'র গোল চারটে করলেন মণ্ডাপ্পা চেঙ্গাপ্পা, অরুমুগম, অ্যালেন ডি' ল্যাসলে, সুকুমারন। ই· এম· ই'র তিন গোলদাতা হলেন পুনাচা, কিশোর এক্কা, এস· বোরা।

দ্বিতীয় খেলাটা বড্ড পানসে লাগল। জলন্ধরের আর্মি সার্ভিস কোর (এ· এস· সি·) নাকানি-চোবানি খাইয়ে ৪—১ গোলে হারাল ইস্টবেঙ্গলকে। সেনাদলের খেলোয়াড়দের স্পিড ও বল সামলানোর ক্ষমতা দেখার মতো। ইস্টবেঙ্গলের ডিফেণ্ডাররা থই পাচ্ছিলেন না। তবে বেশ ক'টা তুমুল হিট রুখে দিয়ে দলকে বেশি গোল খাওয়ার লজ্জা থেকে বাঁচালেন ইস্টবেঙ্গলের চৌখস গোলকিপার জাভেদ। এ· এস· সি'র পক্ষে গোল করলেন মাইকেল বাগে দুটো, টিরকে ও আইন্দ একটা করে। খেলার দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই ফরোয়ার্ডদের সঙ্গে দুই হাফও তেড়েফুঁড়ে উঠে সেনাদলের ডিফেন্সে খানিক ফাটল ধরিয়ে একটা পেনাল্টি স্ট্রোক পেয়ে গেল ইস্টবেঙ্গল। ইকবাল সিং গোল করলেন।

শুক্রবার বিকেলের ফাইনালের লড়াইয়ে ৭—৫ গোলে জিতে বেটন কাপ বাঙ্গালোরে নিয়ে গেলেন এম· ই· জি'র খেলোয়াড়রা। টাইব্রেকার ছাড়াই এক ডজন গোল, বেটন-ফাইনালের ইতিহাসে রেকর্ড! আর-একটা রেকর্ডের কথাও বলি। মোহনবাগান মাঠে হাজির হয়েছিলেন টেনেটুনে শ'চারেক দর্শক!

ন' মিনিটেই ৩—০ গোলে এগিয়ে গেল এম· ই· জি·। অরুমুগমের বাড়ানো বল ধরে দু'জনকে কাটিয়ে চমৎকার রিভার্স ফ্লিক—চেঙ্গাপ্পার প্রথম গোল। নিখুঁত পুশে পরের গোলটাও করলেন চেঙ্গাপ্পা, একার চেষ্টাতেই। জেভিয়ারের স্কোয়ার পাস থেকে তৃতীয় গোলটা চন্দ্রশেখরের। এরপর গোলশোধের পালা। সাড়ে তিন মিনিটের ভেতর আইন্দ ও ভেঙ্গরা পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে বাহারি গোল করলেন। বাইশ মিনিটে ওই পেনাল্টি স্ট্রোক থেকেই চেঙ্গাপ্পা দলকে আরও এগিয়ে দিলেন। ৪—২। বিরতির পর ক্রিস্টোফার লাকরা ও মাইকেল বাগের গোল। ছাপ্পান্ন মিনিটে ৪—৪।

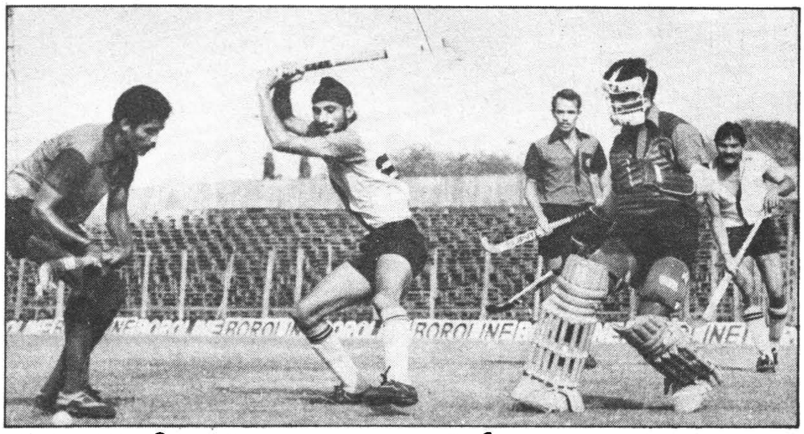

বেটন কাপের হকি-যুদ্ধে ই· এম· ই· বনাম এম· ই· জি·

অতিরিক্ত সময়ের প্রথম মিনিটেই মাঝ-মাঠ থেকে বল টেনে পাঁচজনকে টলিয়ে ক্রিস্টোফার গোল করার দু'মিনিট বাদে জটলা থেকে সুব্রমনিয়ম গোল শোধ করলেন। জেতার গোল দুটো হল অতিরিক্ত সময়ের শেষ চার মিনিটে। চেঙ্গাপ্পার গোলটা পেনাল্টি স্ট্রোক থেকে নিখুঁত পুশ। শেষ মিনিটের গোলটা আয়াপ্পায়ানের। তিন-চারটে নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে 'ম্যান অব দ্য ফাইনাল' হলেন এম· ই· জি'র তুখোড় গোলকিপার যুবরাজ।

বুঝতেই পারছ, টগবগে উত্তেজনা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খেলাটা দিব্যি উপভোগ করলুম। তবে মূলত ভারতের দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া দু'দলের লড়াইয়ে না খুঁজে পেলুম উৎকর্ষ, না চমৎকারিত্ব!

ক্রিকেটারদের গল্প

রাজা গুপ্ত

১৯৭৫-৭৬ সিরিজে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়েলিংটন টেস্টে ভারত হেরেছিল। রিচার্ড হ্যাডলির পেস-তাণ্ডবে ভারত দ্বিতীয় দফায় মুড়িয়ে গিয়েছিল মাত্র ৮১ রানে। রিচার্ড হ্যাডলি নিঃসন্দেহে বিরাট মাপের বোলার। কিন্তু ওয়েলিংটনে শেষ টেস্টের শেষ দিনে হ্যাডলিকে অন্যায় সাহায্য করেছিল ওই মাঠের গ্রাউন্ডস-ম্যানরা।

ভারত যখন দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামে, তখন দেখা গেল উইকেটের ঘাস কাটা হয়নি। মাঠের হেড-মালিকে জিজ্ঞেস করতে সে মাথা নেড়ে জানাল, "হ্যাঁ, ঘাস-কাটার মেশিন তো চালানো হয়েছে।" ভারতের ক্যাপ্টেন বিষেন সিং বেদী পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "মেশিন চালানো হল, অথচ যেমনকার ঘাস তেমনই রইল, কী ব্যাপার ? মেশিনের মধ্যে ব্লেড ছিল তো ?" পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সত্যিই মেশিনের মধ্যে ব্লেড ছিল না। ঘাসের বাড়ন্ত ডগা এবং একটি মারাত্মক স্পট কাজে লাগিয়ে হ্যাডলি চূর্ণ করেন ভারতকে। খেলার শেষে বেদী বলেছিলেন, "নিউজিল্যান্ড যখন ভারত সফরে যাবে, তখন আমরা দেখিয়ে দেব, আমাদের গ্রাউন্ডসম্যানরা যে ঘাস ছাঁটাইয়ের মেশিন ব্যবহার করে, তাতে ব্লেড থাকে।"

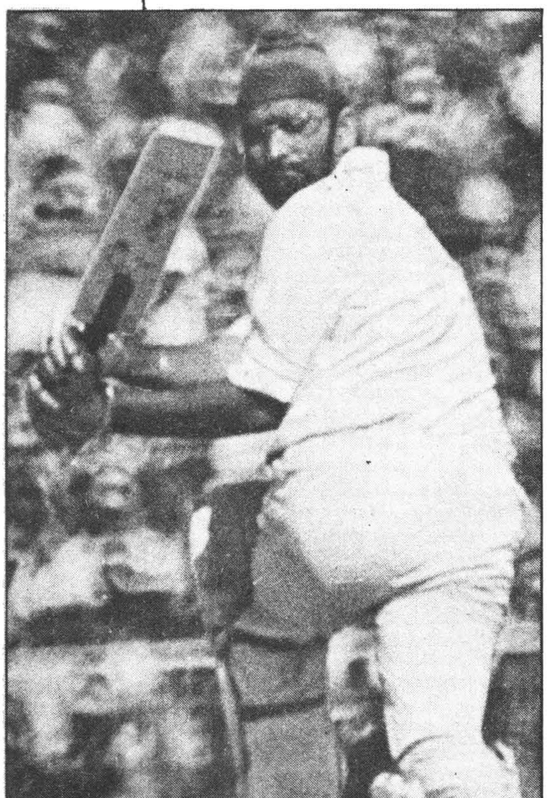

বিষেন সিং বেদী

* * *

১৯৫৮ সিরিজে আলেকজান্ডারের অধিনায়কত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এসেছে ভারত সফরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সঙ্গে এসেছেন সুখ্যাত ব্যাটসম্যান রোহন কানহাই। ভারতের বিখ্যাত লেগব্রেক-গুগলি বোলার সুভাষ গুপ্তে তখন দারুণ ফর্মে। প্রথম টেস্টে কানহাইকে আউট করেই গুপ্তে টেস্টে নিজস্ব ১০০তম উইকেট সংগ্রহ করলেন। পরের টেস্ট কানপুরে, গুপ্তে আবার আউট করলেন কানহাইকে। এবং চা-টেবিলে সকলের সামনেই কানহাইকে তাচ্ছিল্য করে বললেন, "এই যে বাচ্চা খরগোশ ?"

একটা কথাতেই কান লাল হয়ে গেল কানহাইয়ের। কোনওরকমে কষ্ট করে হেসে-হেসে জবাব দিলেন, "ঠিক আছে, পরের বার দেখা যাবে।"

আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেবার জন্যে এই ধরনের তাচ্ছিল্য এবং উপেক্ষা করার চল ক্রিকেটারদের মধ্যে ছিল। কিন্তু মনে মনে তৈরি হলেন কানহাই একটা যোগ্য জবাব দেবার জন্য।

পরের টেস্ট কলকাতায়। গ্যারি সোবার্সের পেটের গণ্ডগোল থাকায় ওয়ান ডাউনে ব্যাট করতে গেলেন কানহাই। তারপর ২৫৬ রানের এক অবাক-করা ইনিংস খেললেন। ইনিংসটি আজও ইডেনের সর্বোচ্চ রানের ইনিংস। গুপ্তের স্পিনের সম্মোহনী

রোহন কানহাই

বিদ্যে আর কাজে এল না।

ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ দুর্দান্ত ইনিংস খেলার জন্য একটা বাঘের মাথা উপহার দিলেন কানহাইকে। প্রতিষ্ঠা এবং অহঙ্কার নিয়ে আজও সেই বাঘের মাথা টাঙানো আছে ব্রিটিশ গায়নায় কানহাইয়ের মায়ের বাড়ির দেওয়ালে।

গল্পটা কিন্তু এখানেই শেষ নয়। কারণ, গল্পটা এখানে শেষ হলে, গুপ্তেকে মুছে ফেলতে হয় মন থেকে। হ্যাঁ, দ্বিতীয় টেস্টের এক ইনিংসে ৯টি উইকেট নেবার জন্য গুপ্তেকেও উপহার দেওয়া হয়েছিল একটা বাঘের চামড়া।

আপনি কি...
ভালো কোয়ালিটি পাবার জন্যে বেশী দাম দিচ্ছেন?
না, বাজে কোয়ালিটি কিনছেন?

বিজ-এর সুষমতা
গ্রহণ করুন!

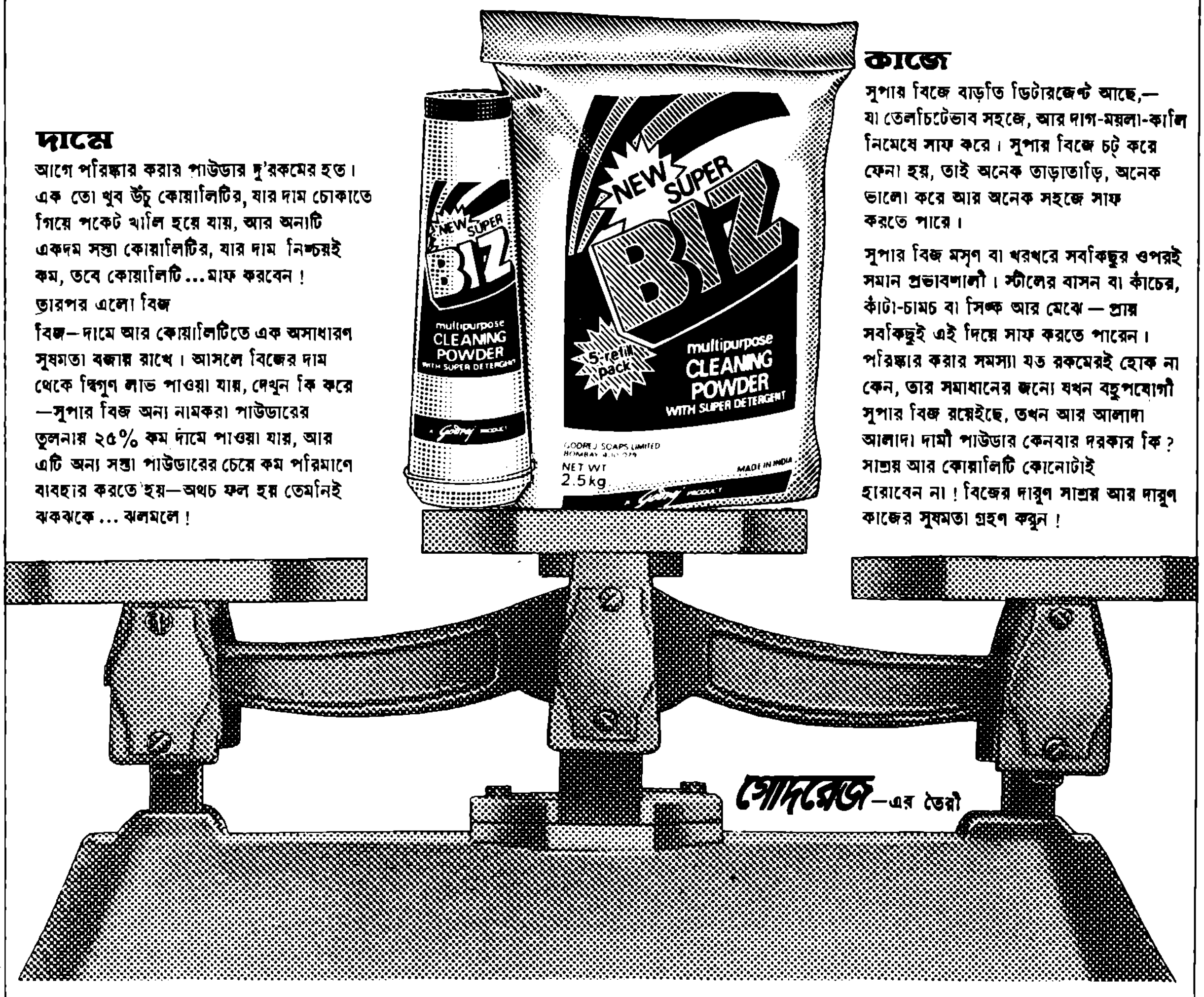

দামে
আগে পরিষ্কার করার পাউডার দু'রকমের হত। এক তো খুব উঁচু কোয়ালিটির, যার দাম চোকাতে গিয়ে পকেট খালি হয়ে যায়, আর অন্যটি একদম সস্তা কোয়ালিটির, যার দাম নিশ্চয়ই কম, তবে কোয়ালিটি...মাফ করবেন!

তারপর এলো বিজ

বিজ—দামে আর কোয়ালিটিতে এক অসাধারণ সুষমতা বজায় রাখে। আসলে বিজের দাম থেকে দ্বিগুণ লাভ পাওয়া যায়, দেখুন কি করে—সুপার বিজ অন্য নামকরা পাউডারের তুলনায় ২৫% কম দামে পাওয়া যায়, আর এটি অন্য সস্তা পাউডারের চেয়ে কম পরিমাণে ব্যবহার করতে হয়—অথচ ফল হয় তেমনিই ঝকঝকে... ঝলমলে!

কাজে
সুপার বিজে বাড়তি ডিটারজেণ্ট আছে,—যা তেলচিটেভাব সহজে, আর দাগ-ময়লা-কালি নিমেষে সাফ করে। সুপার বিজে চট্ করে ফেনা হয়, তাই অনেক তাড়াতাড়ি, অনেক ভালো করে আর অনেক সহজে সাফ করতে পারে।

সুপার বিজ মসৃণ বা খরখরে সবকিছুর ওপরই সমান প্রভাবশালী। স্টীলের বাসন বা কাঁচের, কাঁটা-চামচ বা সিঙ্ক আর মেঝে—প্রায় সবকিছুই এই দিয়ে সাফ করতে পারেন। পরিষ্কার করার সমস্যা যত রকমেরই হোক না কেন, তার সমাধানের জন্যে যখন বহুপযোগী সুপার বিজ রয়েইছে, তখন আর আলাদা আলাদা দামী পাউডার কেনবার দরকার কি? সাশ্রয় আর কোয়ালিটি কোনোটাই হারাবেন না! বিজের দারুণ সাশ্রয় আর দারুণ কাজের সুষমতা গ্রহণ করুন!

দাম কম হলে কি হয়, তেমনিই ঝকঝকে...ঝলমলে রয়!

CASGS-163-244BEN

Anandamela 16 April 1986. Regd. No. WB/CC/264. MH By-South 683TN/MS(c)/731